ESTD.1967

সুবর্ণজয়ন্তীর আলোয়

# দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ

অরঙ্গাবাদ ○ মুর্শিদাবাদ

১৯৬৭ - ২০১৭

## স্মরণিকা

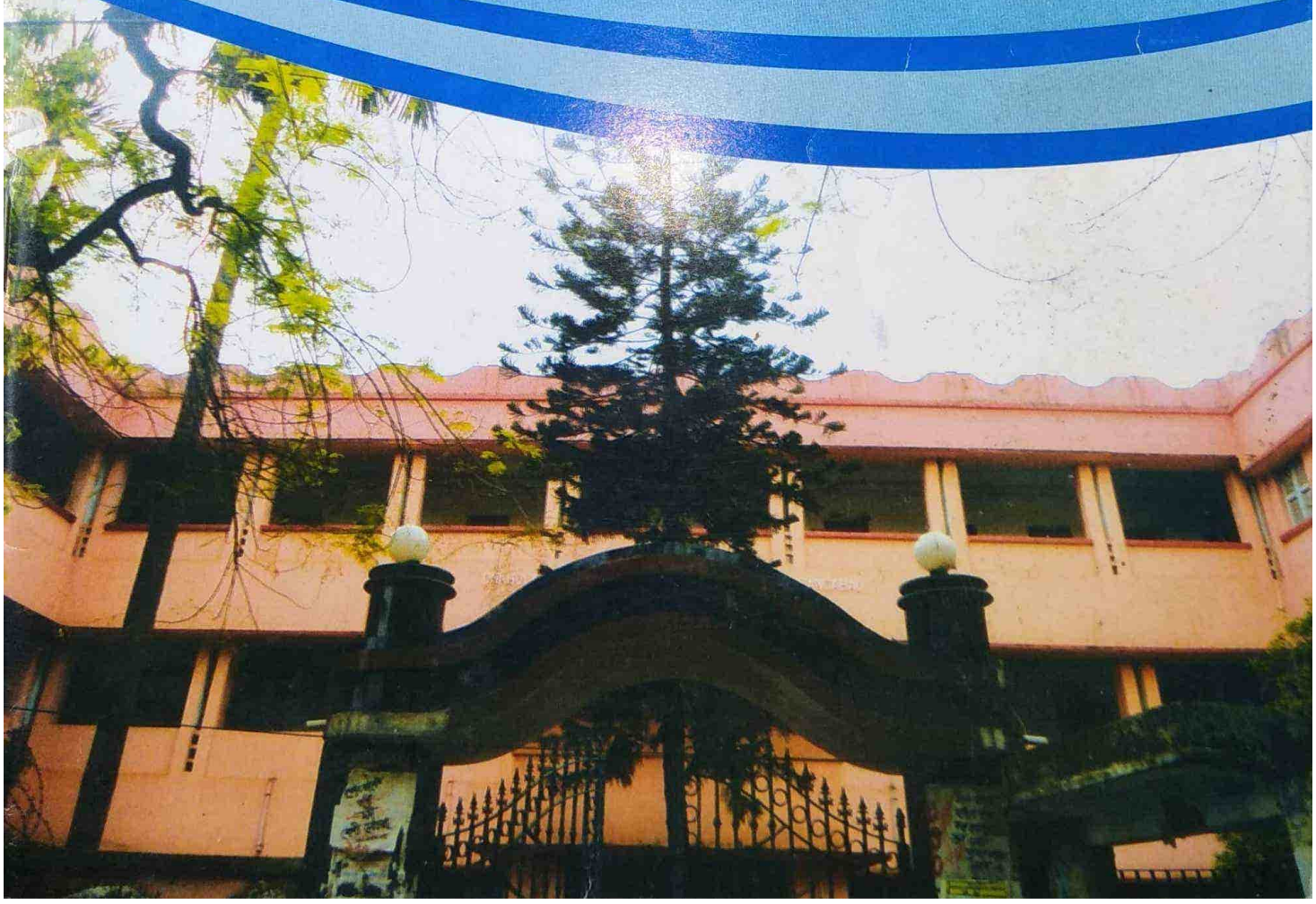

# জমিদাতা

স্বর্গীয় দুঃখুলাল দাস

স্বর্গীয় নিবারণ চন্দ্র দাস

# প্রতিষ্ঠাতা

স্বর্গীয় দিলীপ দাস

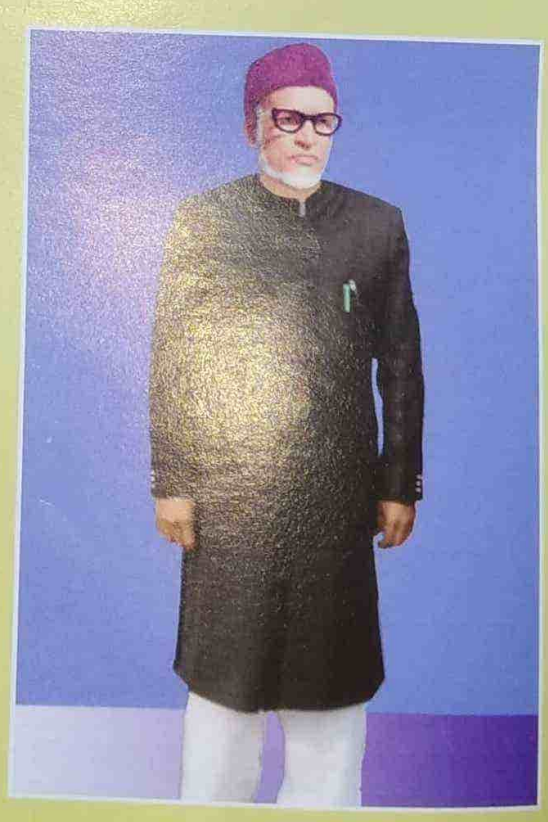

মরহুম লুৎফল হক

## জাতীয় সেমিনার

## সৌজন্য সাক্ষাৎকার

## NAAC 2009 & 2016

## সাউথ ব্লক দ্বারোদ্‌ঘাটন

## সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

## জেনারেল বডি মিটিং ও ইফতার মজলিশ

# দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ

স্থাপিত - ১৯৬৭

## গৌরবময় সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন

## স্মরণিকা
## ২০১৭

অরঙ্গাবাদ ▫ মুর্শিদাবাদ

**প্রকাশক**

অধ্যাপক নিখিলেন্দু বিকাশ দাস

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ

ডি. এন. কলেজ

অরঙ্গাবাদ

**প্রচ্ছদ রূপায়নে**

অধ্যাপক বিধানবরণ মুখোপাধ্যায়

প্রাক্তন অধ্যাপক, ডি. এন. কলেজ

**মুদ্রণে**

নতুন গতি লেজার প্রিন্ট

৮৮, তালতলা লেন

কলকাতা - ১৪

মো. - ৯৮৩০১৫৫২৪৩

**সংকলন ও সম্পাদনায়**

অধ্যাপক সাধন কুমার দাস

ড. পার্থ চ্যাটার্জী
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং
জৈব প্রযুক্তি বিভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ,
পরিষদীয় বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ০৯১
দূরভাষ : ২৩৩৪ ৬১৮১/২২৫৬, ২৩৩৭ ৬১৭২
ফ্যাক্স : ২৩৩৭ ৬৭৮৩/২৩৫৮ ৮৮৫৮

Dr. PARTHA CHATTERJEE
*Minister-in-charge*
Departments of Higher Education, Science & Technology and Biotechnology, School Education, Parliamentary Affairs
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata - 700 091
Tele : 2334 6181/2256, 2337 6172
Fax : 2337 6783/2358 8858

No. – 415/MIC/HED, S&T, BT, SED&PA/WB/17-18

## *Message*

I am delighted to know that ***Dukhulal Nibaran Chandra College*** is going to celebrate its ***Golden Jubilee*** from 16th August to 30th August, 2017.

On this occasion, I extend my felicitations and congratulations to all students, teaching and non-teaching staff of ***Dukhulal Nibaran Chandra College*** and wish the programme a grand success.

**(Dr. Partha Chatterjee)**

**Janab Mustak Hossain**
President, Governing Body
Dukhulal Nibaran Chandra College

Nabanna : 325, Sarat Chatterjee Road, Howrah-711 102, Room No. 101, Telefax : 2250 1157

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

*An Autonomous Institution of the University Grants Commission*

# Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Dukhulal Nibaran Chandra College
Aurangabad, Dist. Murshidabad, affiliated to University of Kalyani,
West Bengal as
Accredited
with CGPA of 2.38 on seven point scale
at B grade
valid up to December 01, 2021

Date : December 02, 2016

Director

EC(SC)/19/A&A/43.2

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वयत्त संस्थान
NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL
*An Autonomous Institution of the University Grants Commission*

# Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Dukhulal Nibaran Chandra College
Murshidabad, Jangipur, Aurangabad, affiliated to University of Kalyani, West Bengal as
Accredited
with CGPA of 2.33 on four point scale
at B grade
valid up to September 29, 2014

Date : September 30, 2009

Director

# গোড়ার কথা

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের একটি মফঃস্বল গ্রাম। টিভি ছিল না, মোবাইল ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না। শুধু তাই নয়— রাস্তাঘাট ছিল না, পরিবহন ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। সরু ফিতের মতো পড়ে থাকা নির্জন জাতীয় সড়ক, সারাদিনে হাতে গোনা কয়েকটা বাস। সেখান থেকে অরঙ্গাবাদের ভেতরে আসার একমাত্র যানবাহন ঘোড়ার গাড়ি। এই রকম এক প্রত্যন্ত এলাকায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরতম প্রান্তে, এলাকার সর্বস্তরের মানুষের ঐকান্তিক আগ্রহে ও অর্থানুকূল্যে একদিন এই কলেজের জন্ম হয়েছিল। কলকাতার সঙ্গে দূরত্বের ব্যবধান বিস্তর, এলাকা তখনো অনুন্নত, বিড়ি-শিল্প নির্ভর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বসবাস। সেই পরিবেশে, সেই সময়ে এমন একটি কলেজ কেমন করে গড়ে উঠেছিল আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তা আন্দাজ করা বেশ কঠিন। যাঁরা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কারিগর, আজকের দিনে বারবার কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আমরাও তাঁদের পরিশ্রম ও অবদানের কথা বিনীত চিত্তে স্মরণ করি।

সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষে দাঁড়িয়ে মনে হয়, পঞ্চাশ বছরে এই কলেজের যে-সমৃদ্ধি প্রত্যাশিত ছিল, তা হয়তো হয়নি। তবু বছরে বছরে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে, মূল ভবনের সঙ্গে সংলগ্ন হয়েছে বিরাট এক খেলার মাঠ, যা শুধু কলেজ নয়, গোটা অরঙ্গাবাদবাসীর গর্ব। মূল ভবনের পাশে গড়ে উঠেছে এবং গড়ে উঠছে আরও কিছু শাখা ভবন। বিষয়ভিত্তিক পঠন পাঠনের পরিসর বেড়েছে, বেড়েছে ছাত্রস্বার্থ সংশ্লিষ্ট আরো কিছু নতুন বিভাগ। বহুগুণ বেড়ে গেছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা। সেই অনুপাতে অবশ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হয়নি এবং বহু পুরনো পদও শূন্য রয়ে গেছে। ফলে ছাত্র শিক্ষক সংখ্যার অনুপাত নিয়ে একটি প্রশ্নচিহ্ন সুবর্ণজয়ন্তীবর্ষেও আমাদের অস্বস্তি জাগিয়ে রাখে।

আগামী দিনে হয়তো এই সমস্ত অসুবিধার জায়গাগুলো দূর হয়ে যাবে। একদিন স্থানীয় কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের ঐকান্তিক চেষ্টায় এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে মাটির প্রদীপখানি জ্বালানো হয়েছিল, আগামীদিনে তা আরো জ্যোর্তিময় হয়ে উঠবে এবং শতবর্ষের দিকে যেতে যেতে আরো বিকশিত ও উজ্জ্বলিত হয়ে উঠবে— আজকের এই শুভদিনে আমরা এই প্রার্থনা জানাবো।

আর একটি বিষয় অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করাই ভালো, তা হল, কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকায়, মুদ্রণ প্রমাদের ও অন্য কিছু বিষয়ে পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া গেল না, এ জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। সবাইকে যথাযোগ্য সম্মান, আন্তরিকতা ও ভালোবাসা জানিয়ে আমাদের প্রয়াস সার্থক হবে এই আশায় রইলাম।

প্রকাশক ঃ স্মরণিকা
সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন
২০.০৯.২০১৭

# দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ
# নব-গৃহ প্রবেশ অনুষ্ঠান

## অধ্যক্ষের ভাষণ

**অরঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ**
**১১ নভেম্বর ১৯৬৮**

শ্রদ্ধেয় সভাপতি,
মাননীয় উপাচার্য ডঃ সেন, শ্রীমতী সেন,
ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আজকের দিনটি আমাদের কাছে এক পরম আনন্দের দিন। এক বৎসর আগে যে শিশু-প্রতিষ্ঠানটিকে তার জন্ম-লগ্নে একটি পরিত্যক্ত গুদান ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলাম আজ তাকে আমরা নিজস্ব নব-নির্মিত ভবনে স্থান করে দিতে পেরেছি। এই পুণ্যলগ্নে উপাচার্য ডঃ সেন, শ্রীমতী সেন ও অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসুর মতো পণ্ডিত ও শিক্ষাদরদীদের আমাদের মাঝে পাওয়ার সৌভাগ্য হওয়ায় দিনটি আমাদের কাছে আরও বেশি আনন্দময় হয়ে উঠেছে। গ্রাম-বাংলার এক প্রত্যন্ত সীমায় অবস্থিত এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে তাঁরা যে সাড়া দিয়েছেন সেজন্য আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। তাঁদেরকে পেয়ে আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত।

১৯৬৭ সালে শুধুমাত্র কলা বিভাগে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি নিয়ে এই মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এক বৎসরের মধ্যে আমরা আরও কিছুটা সম্প্রসারণ করতে পেরেছি। বর্তমান শিক্ষা-বর্ষ থেকে নৈশ-বিভাগে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্নাতক পর্যায়ে বাণিজ্য বিষয় সমূহ পড়ানোর অনুমতি আমরা পেয়েছি।

সমস্যা ছিল নিজস্ব ভবনের। প্রায় দু'লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ সমাপ্ত করে সে সমস্যার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। যাঁদের অকৃপণ দানে ও অর্থানুকূল্যে এই ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়েছে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর ধন্যবাদ জানাচ্ছি আলাউদ্দিন, ইউসুফ মিস্ত্রী, মন্মথ ভাস্কর ও সেই সব নাম না জানা অগণিত মজুর ও কারিগরদের যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এই ভবনটি আজকের রূপ লাভ করেছে। এই ভবন নির্মাণ কার্য তদারক করার জন্য আমরা জেলা স্কুল বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত ওভারসিয়ার শ্রী অশ্বিনী কুমার ঘটককে পেয়েছিলাম। তাঁর মতো সুযোগ্য ব্যক্তিকে না পেলে এই সময়ের মধ্যে ভবন নির্মাণ সম্পন্ন করা অসম্ভব ছিল। আরও একজনের নাম আমি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ না করে পারছি না। তিনি হলেন এম. বি. এম. কোম্পানির অন্যতম ডাইরেক্টর শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস। তাঁর অদম্য উৎসাহ, উদ্যম, সহযোগিতা ও কর্ম প্রচেষ্টা এই ভবন নির্মাণ কার্যের সঙ্গে যুক্ত না হলে এ কাজ এত তাড়াতাড়ি আরম্ভ ও সমাপ্ত করা সম্ভব হতো না। এঁদের দু'জনকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ ছাড়া বিল্ডিং কমিটির সদস্যগণ এবং অন্য যেসব বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী আমাদের বিভিন্ন সময় নানাভাবে সাহায্য করেছেন, উপদেশ দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন তাঁদেরকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে একটি মাত্র সমস্যার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু অবশ্য করণীয় বহু কাজ এখনো বাকি রয়েছে। ছাত্রদের জন্য উপযুক্ত নিজস্ব ছাত্রাবাস আমাদের

নেই। তার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করা প্রয়োজন। খেলাধূলো শিক্ষার এক অপরিহার্য অঙ্গ। সেজন্য কলেজের নিজস্ব খেলার মাঠ থাকা অবশ্য প্রয়োজন। খেলার মাঠের জন্য কলেজ সংলগ্ন যে স্থানটি নির্দিষ্ট করা আছে তা একটি পূর্ণাঙ্গ মাঠের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাঁর সঙ্গে আরও কিছু জমি যুক্ত করতে পারলে এবং মাঠ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতে পারলে তবেই মাঠের অভাব মিটবে। এদিকেও অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সর্বোপরি কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা এখনো আমরা করতে পারিনি। সেজন্য এ অঞ্চলের বহু ছাত্রকে দূর দূরান্তরে পড়াশুনোর জন্য যেতে হয়। বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত কলেজ পূর্ণতা লাভও করবে না। তার জন্য প্রাথমিক স্তরেই কমপক্ষে দু'লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে। শিক্ষকদের বাসস্থানের সমস্যাও এখানে এক মস্ত বড় সমস্যা। উপযুক্ত বাসস্থান এবং মোটামুটি স্বচ্ছন্দে জীবন-যাপনের সুযোগ করে দিতে না পারলে এই দূর গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত শিক্ষকদের আকর্ষণ করা এবং আটকে রাখা যাবে না। সুতরাং এদিকেও আশু দৃষ্টি দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

এক বৎসরের মধ্যে আমরা যতটুকু কাজ করতে পেরেছি তা খুব কম না হলেও সামগ্রিক প্রয়োজনের নিরিখে বিচার করলে তা অতি সামান্য। যে কাজ এখনো অপূর্ণ রইল তার বিপুলতা মাঝে মাঝে আমার মনে নৈরাশ্যের ছায়া ফেলে। তবুও আমি পুরোপুরি নৈরাশ্যবাদী নই। আমি আশাবাদী। আমার বিশ্বাস আছে অবিচলিত নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায় নিয়ে যদি আমরা অগ্রসর হই, আমাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে যদি সততা থাকে তবে কাজ যত দুরূহই হোক না কেন তা আমরা সমাধা করতে পারবোই। সমস্যা অর্থের। কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি— যাঁদের দানে ও অর্থানুকূল্যে এই ভবন নির্মাণ সম্ভব হয়েছে তাঁদের অকৃপণ হস্ত উন্মুক্তই থাকবে যতদিন পর্যন্ত না এই মহাবিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আমি আরও বিশ্বাস এবং আশা রাখি— যাঁরা প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো ভুল বোঝাবুঝির জন্যই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক এই মহৎ প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত রাখতে পারেননি তাঁরাও অতীতকে ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে এই সৃষ্টিমূলক কাজে সহযোগিতার উদার হস্ত প্রসারিত করবেন এবং সাধ্যানুযায়ী অর্থ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবেন।

অরঙ্গাবাদবাসীদের অনেকেরই হয়তো জানা নেই এই অরঙ্গাবাদেই এই মহকুমার প্রথম সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক স্থাপিত হওয়ার দু'বছরের মধ্যেই সদর দপ্তর জঙ্গীপুরে স্থানান্তরিত হলো। তা যদি না হতো তবে অরঙ্গাবাদ আরও উন্নত হতে পারত এবং মহকুমার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হতে পারতো। কিন্তু যা হয়নি তার জন্যে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। আমাদের যদি আন্তরিকতা থাকে, অধ্যবসায় থাকে, উদ্যম থাকে তবে সদর কার্যালয় না হওয়া সত্ত্বেও এই স্থানটির গুরুত্ব আমরা বাড়াতে পারি— এই মহাবিদ্যালয়টিকে উচ্চশিক্ষার একটি আদর্শ কেন্দ্ররূপে রূপান্তরিত করে। সে কাজে আর্থিক দিকের দায়িত্ব যদি আপনারা সকলে সাগ্রহে এবং আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেন তবে শিক্ষাগত দিকের দায়িত্ব আমি এবং আমার সুযোগ্য সহকর্মীগণ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করব সে আশ্বাস আপনাদের দিতে পারি। আপনাদের আর্থিক সহযোগিতা, শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা এবং ছাত্রদের অধ্যবসায় ও একাগ্রতা—এই তিনের সমন্বয় ঘটাতে পারলে এই মহাবিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব হবে না—এ বিশ্বাস আমার আছে। শিক্ষকদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার কোনো অভাব নেই। ছাত্রদের মধ্যেও যথেষ্ট উদ্যম ও অধ্যবসায় রয়েছে। যদিও মাঝে মাঝে বাইরের কিছু দুষ্ট প্রভাব ঝড়ো হাওয়ার মতো এসে সরল-স্বভাব, অপরিণত বুদ্ধি, সুকুমারমতি ছাত্রদের মনকে বিষাক্ত ও বিক্ষিপ্ত করে তোলার চেষ্টা করে তথাপি আমার স্থির বিশ্বাস আছে অধিকাংশ ছাত্রের শুভবুদ্ধি এবং অধ্যাপকদের আদর্শ-নিষ্ঠা ওই সব অশুভ প্রভাব কাটিয়ে শিক্ষার উপযোগী আদর্শ পরিবেশ বজায় রাখতে সক্ষম হবে। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিটি নাগরিক অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখতে সাহায্য করবেন সে বিশ্বাসও আমি রাখি।

আমাদের কাজ অত্যন্ত দুরূহ, সম্বল অত্যন্ত সীমিত। তবুও ভবিষ্যতের জন্য আমরা গড়ে যাচ্ছি এইটুকুই আমাদের তৃপ্তি এবং আনন্দ। জ্ঞানের যে প্রদীপ শিখা আমরা জ্বালিয়ে যাবো অনাগত যুগের শত শত শিক্ষক এসে তাকে চিরকালের জন্য করে রাখবেন প্রজ্জ্বলিত, আর শত শত বৎসর ধরে কত জ্ঞান-তাপস এসে সেই প্রজ্জ্বলিত শিখায় নিজেদের করে তুলবে প্রদীপ্ত। আমাদের আজকের সৃষ্টি আগামী দিনে হবে আরও উজ্জ্বলতর।

ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

(লেখাটি কলেজে সংরক্ষিত রয়েছে)

বিজন কান্তি বিশ্বাস
*অধ্যক্ষ*

# List of Principal / Lecturer-in-charge

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Prof. Bijan Kanti Biswas | Principal | 19.07.67 - 15.01.70 |
| 2. | Prof. Shyam Sundar Bhattacharya | Principal in charge | 16.1.70 - 05.07.70 |
| 3. | Prof. Ram Gopal Bhattacharya | Principal | 06.07.70 - 17.02.72 |
| 4. | Prof. Srikumar Acharya | Principal | 18.02.72 - 06.01.82 |
| 5. | Prof. Anil Chandra Guha | Principal | 26.07.82 - 12.01.88 |
| 6. | Prof. Dhirendranath Biswas | Lect. in charge | 13.01.88 - 30.04.97 |
| 7. | Prof. Santi Ranjan Pande | Lect. in charge | 01.05.97 - 31.07.97 |
| 8. | Prof. Abdul Wahid | Principal | 01.08.97 - 31.03.98 |
| 9. | Prof. Santi Ranjan Pande | Lect. in charge | 01.04.98 - 31.01.99 |
| 10. | Prof. Dr. Ajit Kr. Choudhury | Lect. in charge | 01.02.99 - 10.04.01 |
| 11. | Prof. Dr. Tapas Kr. Banerjee | Principal | 11.04.01 - 04.08.03 |
| 12. | Prof. Dr. Ajit Kr. Choudhury | Lect. in charge | 05.08.03 - 30.06.05 |
| 13. | Prof. Ram Chandra Das | Lect. in charge | 01.07.05 - 15.12.06 |
| 14. | Prof. Dr. Bijoy Kr. Sarkar | Principal | 16.12.06 - 28.02.07 |
| 15. | Prof. Nikhilendu Bikash Das | Lect. in charge | 08.03.07 - 03.10.12 |
| 16. | Prof. Dr. Tapan Kr. Karmakar | Principal | 04.10.12 - 04.01.14 |
| 17. | Prof. Dr. Syamal Kr. Mondal | Lect. in charge | 13.02.14 - 30.06.17 |
| 18. | Prof. CA Nikhilendu Bikash Das | Lect. in charge | 01.07.17 - |

# Staff Pattern : August 1967

**Teaching Staff**

| | |
|---|---|
| 1. Prof. Sudharanjan Sengupta | English |
| 2. Prof. Biswanath Roy | Bengali |
| 3. Prof. Dhirendranath Biswas | History |
| 4. Prof. Shyamsundar Bhattacharya | Pol. Science |
| 5. Prof. Jagabandhu Mondal | Commerce |
| 6. Prof. Shanti Ranjan Pandey | Philosophy |
| 7. Prof. Jati Kumar Roy | Economics |

**Office Staff**

| | |
|---|---|
| 1. Sri Dibakar Pal | H.C. Cum Accountant |
| 2. Sri Rakhahari Mukherjee | Cashier cum clerk |
| 3. Sri Santosh Kr. Sarkar | Asst. Librarian |
| 4. Sri Narendranath Barik | Principal's Bearer |
| 5. Nazrul Islam | Bearer |

# Staff-Pattern : August - 2017

**Department of Commerce (H)** — **COMMERCE**

| | | |
|---|---|---|
| 1. CA Nikhilendu Bikash Das | M.Com, M.Phil, LL.B | Associate Professor |
| 2. Dr. Syamal Kr. Mondal | M.Com, M.Phil, Ph.D | Associate Professor |
| 3. Vacant | | |
| 4. Sri Madhab Kr. Biswas | M. Com | Associate Professor |
| 5. Sri Sukhen Kr. Mondal | M.Com | Guest Teacher |
| 6. Tofajjel Ahmed | M.A., L.L.B. | Guest Teacher |

**Department of Pol. Science (H)** — **ARTS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vacant | | |
| 2. Smt. Krishna Roy | M.A. M. Phill | Assistant Professor |
| 3. Smt. Shinjana Bandhyapadhyay (Chakraborty) | M.A. | Assistant Professor |
| 4. Vacant | | |
| 5. Smt. Pampa Banerjee | M.A. | PTT |
| 6. Nasrat Begum | M.A. | PTT |
| 7. Salauddin Sheikh | M.A. | PTT |
| 8. Smt. Marium Reza | M.A. | PTT |

**ARTS**

**Department of Bengali (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Sadhan Kr. Das | M.A. | Associate Professor |
| 2. Dr. Sunil Kr. Dey | M.A. Ph.D. | Associate Professor |
| 3. Vacant | | |
| 4. Sri Arup Bhattacharyya | M.A. | PTT |
| 5. Aklach Mondal | M.A. | PTT |
| 6. Masud Rana | M.A. | Guest Teacher |

**Department of English (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Eeshan Ali | M.A. | Assistant Professor |
| 2. Sri Raj Kumar Halder | M.A. | Assistant Professor |
| 3. Smt. Antara Saha | M.A., M. Phil PGCTE, PGDTE | CWT |
| 4. Md. Arife Nadim | M.A | PTT |
| 5. Mabudul Islam | M.A. | Guest Teacher |
| 6. Md. Tofijul Islam | M.A. | Guest Teacher |
| 7. Sri Pratap Chandra Mondal | M.A. | Guest Teacher |

**Department of History (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Md. Sablul Hoque | M.A. | Associate Professor |
| 2. Sri Srimanta Das | M.A. | Assistant Professor |
| 3. Sri Sailesh Chandra Roy | M.A. | PTT |
| 4. Md. Najmullah | M.A | PTT |
| 5. Md. Rafikul Islam | M.A. | Guest Teacher |
| 6. Md. Mosiur Rahaman | M.A. | Guest Teacher |

**Department of Philosophy (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Paritosh Barman | M.A. | Assistant Professor |
| 2. Vacant | | |
| 3. Sri Sumanta Ghosh Bagh | M.A. | PTT |
| 4. Sri Sanjoy Paul | M.A | PTT |
| 5. Smt. Nandita Sarkar (Mondal) | M.A. | PTT |
| 6. Sri Sudhan Das | M.A. | Guest Teacher |

**Department of Education (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vacant | | |
| 2. Sri Sonaton Sarkar | M.A. | PTT |
| 3. Sri Amar Mondal | M.A. | PTT |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Sri Debasis Mondal | M.A | Guest Teacher |
| 5. Smt. Amrita Das | M.A. | Guest Teacher |

**Department of Sanskrit (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Jayanta Mondal | M.A. | Assistant Professor |
| 2. Sri Sujay Kr. Pal | M.A. | PTT |
| 3. Smt. Minakshi Laha | M.A. | PTT |
| 4. Smt. Antara Saha | M.A | Guest Teacher |

**Department of Geography (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Subhomoy Kundu | M.A. | Guest Teacher |
| 2. Sri Kaushik Barik | M.A. | Guest Teacher |
| 3. Sri Rakesh Mondal | M.A. | Guest Teacher |
| 4. Sri Gourhari Mondal | M.A | Guest Teacher |

**Department of Economics**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Gopal Chandra Roy | M.A. | Assistant Professor |
| 2. Dr. Sampriti Biswas | M.A., M.Phill, Ph.D | Assistant Professor |

**Department of Physical Education**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Humayun Kabir | M.P.Ed. | PTT |
| 2. Sri Monoranjan Pramanik | M.P.Ed. | PTT |

**Department of Arabic**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Abu Selim | M.A. | Guest Teacher |

**SCIENCE**

**Department of Physics**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dr. Amitlal Bhattacharya | M.Sc., Ph.D. | Assistant Professor |
| 2. Rahima Khatun | M.Sc. | Guest Teacher |

**Department of Chemistry**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vacant | | |
| 2. Sumit Singha | M.Sc. | Guest Teacher |
| 3. Rajia Sultana | M.Sc. | Guest Teacher |
| 4. Sultan Sk. | M.Sc. | Guest Teacher |

**Department of mathematics**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vacant | | |
| 2. Sri Pran Krishna Das | M.Sc. | PTT |
| 3. Begam Samsunnahar | M.Sc. | Guest Teacher |

**Department of Botany**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Anup Kumar Sarkar | M.Sc. | Assistant Professor |
| 2. Suchanda Chakraborty | M.Sc. | Guest Teacher |

**Department of Zoology (H)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Vacant | | |
| 2. Md. Nazir Hossian | M.Sc. | Guest Teacher |
| 3. Monoswita Ghosh Choudhury | M.Sc. | Guest Teacher |
| 4. Sri Prithiwish Sarkar | M.Sc. | Guest Teacher |

**Department of Environmental Science**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Hasnahara Khatun | M.Sc. | PTT |

**Computer Application (W.B.S.C.T.E., Govt. of W.B.)**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Sri Supriyo Sengupta | B.Com, PGDCIM | Faculty In-charge |
| 2. Sri Somnath Guha | M.A., Comp.App. | Faculty |
| 3. Sri Raju Barman | H.S, Comp.App. | Lab-Attendant |

**Health Centre**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Dr. Rajesh Khanna | D.H.M.S(Cal), Physician | Part Time |

**Office Staff**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Md. Horoj Ali | B.A. Hons | Head Clerk |
| 2. Vacant | Officiating Md. Horoj Ali | Accountant |
| 3. Vacant | | Cashier |
| 4. Vacant | Officiating Sri Swadhin Rajak | Clerk |
| 5. Vacant | Officiating Sri Dhruba kr. Barik | Typist |
| 6. Sri Dhruba Kumar Barik | H.S. | Bearer |
| 7. Sri Nanda Kishore Singh | | Darwan |

| | | |
|---|---|---|
| 8. Sri Asok Kr. Roy | | Bearer |
| 9. Sri Adhin Rajak | | Guard |
| 10. Maidul Islam | B.A. | Electrician Cum Caretaker |

**Casual Office Staff**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Mojibur Rahaman | B.Com | Clerk |
| 2. Goutam Pal | H.S. | Gymnasium |
| 3. Sudipta Das | B.A. | Library Bearer |
| 4. Anwar Hossain | B.Com, PHDBM | Office Assistant |
| 5. Md. Khalak Hossain | H.S. | Office Staff |
| 6. Sri Sujit Zamader | | Sweeper |
| 7. Deep Biswas | M.P. | Lab. Attd. |
| 8. Sita Singha | M.P. | Lady Attd. |

**Hostal Staff**

| | |
|---|---|
| 1. Sri Anup Kr. Singha | Helper |
| 2. Sri Prasanta Kr. Dey | Helper |
| 3. Md. Mantu Shaikh | Cook |

**Library Staff**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Nurul Islam | M. Com., M.L.& I.Sc. | Librarian |
| 2. Vacant | | Library Clerk |
| 3. Sri Swadhin Rajak | B. Com. | Library Peon |

'মানুষকে সর্বদা তাহার দুর্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্বলতার প্রতিকার নয়—তাহার শক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে শক্তি পূর্ব হইতে বিরাজিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দাও।'

—বিবেকানন্দ

# সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সভাপতির অভিভাষণ

**মোস্তাক হোসেন**

*সভাপতি, কলেজ পরিচালন সমিতি*

অরঙ্গাবাদের চাঁদড়া গ্রামে আমার জন্ম। প্রাথমিক স্কুলে পড়াকালীন এই কলেজ স্থাপিত হয়। জ্ঞানতঃ আমি জানি, এলাকার জননেতা তথা সাংসদ মরহুম হাজি লুৎফল হক সাহেব এবং তৎকালীন বিড়ি ব্যবসার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী স্বর্গীয় দিলীপ কুমার দাসের যুগলবন্দিতে কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৬৭ সালে। তাঁর বাবা দুঃখুলাল দাস ও জ্যাঠা নিবারণ চন্দ্র দাসকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য জননেতা লুৎফল হক ও দিলীপ কুমার দাস মিলে তাঁদের নামে এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। দিলীপবাবু দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার ফলে শিক্ষানুরাগী এলাকাবাসী এবং কলেজ পরিচালন সমিতি প্রস্তাব করে আমাকে কলেজের সভাপতি করার। আমি এই প্রস্তাব গ্রহণকে অস্বীকার করি। কিন্তু দিলীপবাবু আমাকে ফোন করে কলেজের দায়িত্বভার নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আমি আর তাঁর প্রস্তাবকে অস্বীকার করতে পারিনি। ১৯৯৮ সালের ২০ এপ্রিল (২০.০৪.১৯৯৮) কলেজের পরিচালন সমিতির সভায় আমার নাম পাশ হয়। ওই বছরের ২রা মে (০২.০৫.১৯৯৮) আমি পরিচালন সমিতিতে যোগ দিই। এবং বিগত দু'দশক ধরে সেই দায়িত্ব পালন করছি। এ দায়িত্ব পালন আমার জন্য সৌভাগ্যের। ঘটনাচক্রে আমার কলেজে জড়িত হওয়ার বছরেই ১৯৯৮ সালে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিশেষ করে অরঙ্গাবাদ অঞ্চলে ভীষণ বন্যা হয়। বর্তমান কলেজ গৃহের একতলা ও রাস্তাঘাট ডুবে যায়। এমনকি রাস্তায় বর্ষার বাহন নৌকা একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। একতলা বাদে, কলেজের দোতলা ও তিনতলায় এবং কলেজ স্টুডেন্টস্ হোস্টেলে বন্যাপীড়িত মানুষ জন আশ্রয় গ্রহণ করে প্রায় মাসাধিক দৈনন্দিন বসবাসের ফলে, যা হওয়ার তাই হয়েছিল। বন্যার জল নেমে গেলেও কলেজের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করার উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তোলার জন্য কলেজও স্থানীয় সকল শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবি সম্মানীয় ব্যক্তি বর্গের পরামর্শ অনুসারে কলেজ ও হোস্টেলের সংস্কারে নিজেকে নিয়োজিত করার সুযোগ হয়েছিল এবং কলেজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে ধন্য হয়েছিলাম।

এরপর কিছু কিছু ঘটনা আমাকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়। বিশেষতঃ ১৯৯৯-২০০০ সালের কলেজের ছাত্র ইউনিয়ন নির্বাচনের সময় ভীষণ গোলমাল হয়। গোলমাল রক্তপাত পর্যন্ত গড়ায়। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিয়ে দুই দল ছাত্রের মধ্যে গোলমালের জেরে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চরম হেনস্থার শিকার হতে হয়। প্রায় অচলাবস্থায় চেষ্টা করে ও অভিভাবক, স্থানীয় নেতৃত্ব ও শিক্ষানুরাগী মহৎ ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় আলোচনার ভিত্তিতে কলেজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যবস্থা হয়। সর্বোপরি যতদিন না অবস্থা স্বাভাবিক হয় ততদিন কলেজে তথাকথিত ছাত্র সংসদ নির্বাচন ২০০১-২০০৩ সালের জন্য স্থগিত হয় (G.B. Mutip Dt. 8.3.2001)। এই অবসরে জনসংযোগের মাধ্যমে এলাকার সমস্ত বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক ব্যক্তির সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে ৯.২.২০০২ তারিখে পরিচালন সমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ছাত্র-নির্বাচন স্থগিত করা হয়। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত তথাকথিত ছাত্র-ইউনিয়ন নির্বাচনের মাধ্যমে না করে Merit-cum Attendance Basis-এ ছাত্র প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পদাধিকারী চয়ন করে পরিচালক সমিতির তত্ত্বাবধানে, ছাত্র-সংসদ গঠন করে কাজ চালানোর ব্যবস্থা হয় যা কলেজে আজও বহাল আছে। আর এই বহাল রাখার ব্যাপারে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়ত: কলেজের পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সময়ে যে ভাবে সহযোগিতা চেয়েছেন, তা বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মধ্যেও করার চেষ্টা করেছি এবং করছি। উদাহরণ স্বরূপ, খেলার মাঠের পরিসর বৃদ্ধি ও চারিদিকের দেওয়াল নির্মাণ, কলেজে কম্পিউটার সেন্টার খোলা ও পরিচালনা। কলেজের লাইব্রেরীর বইপত্র ও কম্পিউটার ইত্যাদি বিষয়ে আমি যতটা পেরেছি সাহায্য করার চেষ্টা করেছি।

আজ এই কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীতে আমার আশা সে দিন যে পরিপ্রেক্ষিতে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বাস্তায়নের জন্য আমরা যেন দায়বদ্ধ থাকি। এলাকাবাসী এবং কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সকলের কাছে আমার এই বিনীত নিবেদন।

# ডি. এন. কলেজের ইতিকথা

**অধ্যাপক নিখিলেন্দু বিকাশ দাস** (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ। এ বছর উদ্‌যাপিত হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ। ১৯৬৭ থেকে ২০১৭। এই লম্বা সফরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই প্রতিষ্ঠানের পুঙ্খানুপুঙ্খ জন্মবৃত্তান্ত উদ্ধার করা দুরূহ কাজ। কেননা, আমরা যাঁরা বর্তমানে কর্মরত প্রবীন অধ্যাপক বা শিক্ষাকর্মী, এই প্রতিষ্ঠানের সূচনাকালে আমরা ছিলাম নিতান্তই শিশু। অবসরপ্রাপ্ত হাতেগোনা যে ক'জন ব্যক্তি এখনো জীবিত, যাঁরা প্রথমদিন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের ধূসর স্মৃতির উপর নির্ভর করে এবং সেই সময়ের হলুদ হয়ে যাওয়া কিছু জীর্ণ নথির উপর ভিত্তি করে কলেজের ইতিকথার একটি রূপরেখা আঁকার চেষ্টা করা যায়।

আসলে যে কোনো ইতিহাসের গায়ে সময়ের পলি পড়ে। কিছু মিথ, কিছু কিংবদন্তি যুক্ত হয়ে প্রকৃত তথ্যকে কিছুটা আবৃত করে। এতদঞ্চলে তথা জঙ্গিপুর মহকুমার আনাচে কানাচে লোকমুখে শোনা যায়, এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ভাবনার কুঁড়ি ফোটে শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবীদের এক সান্ধ্য আড্ডায়, যা প্রস্ফুটিত হয় তদানিন্তন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিধায়ক হাজি লুৎফল হক ও এম. বি. এম. কোম্পানির কর্ণধার রাজাবাবু তথা শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার দাস মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে।

কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের গবেষক ছাত্রের মতো আমি মাঝে মাঝেই হাতড়ে বেড়িয়েছি বহু পুরনো নথিপত্র। পঞ্চাশ বছরে বহু নথিপত্রই স্থানবদল করেছে— এ ঘর থেকে ও ঘর, এ আলমারি থেকে সে-আলমারি। ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় যখন কলেজের একতলার মেঝেতে হাঁটু বরাবর জল, তখন কিছু খাতাপত্র আগোছালো হয়েছে। তারমধ্যে যেটুকু সংরক্ষিত রয়েছে, তা থেকে জানা যায় কলেজ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ হিসেবে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠিতে (No. C/74/ Affiliation CU. dt. 17/07/1966) IC / Registrar জানালেন যে কলেজের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে (Dt. 5.7.1966) ১৯৬৬-৬৭ সেশনের জন্য অনেক দেরিতে প্রস্তুতি নেওয়ার কারণে ও গৃহনির্মাণ তহবিলের জন্য যে ২৫০০০ টাকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল, তা অপ্রতুল বিবেচনায় এবং জেনারেল ফান্ডে ৫০,০০০, Res. fund-এ ১০,০০০, Salary deficit fund-এ ২৫,০০০ প্রভৃতিতে মোট ১,৩০,০০০ টাকার সংস্থান করে পরবর্তি সেশনে আবেদন করার জন্য বলা হয়েছিল। এর আগে ৮/৪/১৯৬৬ তারিখের একটি সভার কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে অরঙ্গাবাদ হাইস্কুলে ক্লাস শুরুর প্রস্তাবনা WBBSE-এর অনুমতি না পাওয়ায় সকলের আবেদনে M/s. P. Sen & Co-র বদান্যতায় কোম্পানির Senco's Godown-এ ক্লাশ শুরু করার প্রস্তাবনায় D. Sen ও অন্যান্য ভ্রাতার অনুমোদনের মাধ্যমে ব্যবস্থা হয়। ১৬/৬/১৯৬৭ তারিখের M/S. P. Sen & Co. লিখিত অঙ্গীকারপত্র, যা ডি. বি. সেন ও ডি. সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের স্বাক্ষরের দ্বারা নিশ্চিত হয়।

এর আগে ডি. এন. কলেজ কমিটির চিঠির উত্তরে ৬/৪/৬৭ তারিখে (চিঠি নং C/1528/Affel) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৪/৭/১৯৬৬ তারিখের চিঠি অনুযায়ী (নং C/74/ Affi.cu) শর্তসমূহ পূরণ অর্থাৎ ন্যূনতম তহবিলের ব্যবস্থা করে আবেদন করার পরামর্শ দেন।

২০/৪/১৯৬৭ তারিখে ডি. এন. কলেজের সেক্রেটারি শ্রী দিলীপ কুমার দাস অর্থাৎ রাজাবাবুর অঙ্গীকারপত্র যার দ্বারা

জেনারেল ফাণ্ডে ৭৬,০০০ টাকা ও বিল্ডিং ফান্ডে ২৫,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে ৭/৬/৬৭ তারিখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (C/1904/1906/Affi) তদানীন্তন কলেজ পরিদর্শক Dr. N.K. Bhattacharya-কে প্রস্তাবিত কলেজ পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ করেন।

এই সংবাদ পেয়ে ২২/৬/৬৭ তারিখে শ্রীযুক্ত বিজন কান্তি বিশ্বাস মহাশয়কে (যিনি গত ২০১৬-র জুন মাসে পরলোক গত) অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করে ও কলেজের নিজস্ব গৃহনির্মাণের অঙ্গীকারসহ কাগজপত্র জমা দেওয়া হয় এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে ২৮/৬/৬৭ তারিখে কলেজ পরিদর্শন হয়।

সেই পরিদর্শনের রিপোর্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট তার ৮/৭/৬৭ তারিখের বৈঠকে অনুমোদন করে (চিঠি নং C/159/Affi dt. 25.7.67)। এর দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক বহু সাধনার বহু প্রতীক্ষার, বহু ঐকান্তিক চেষ্টার, বহু বহু আরো কত কিছু উন্মাদনার সফল সমাপ্তি ঘটালেন। উচ্চশিক্ষার জন্য আকাঙ্ক্ষিত শ্রমজীবী, গরীব অভিভাবকের (যারা অধিকাংশই অশিক্ষিত) পুত্র কন্যার (যারা পড়াশোনার মধ্যেও বাল্য শ্রমিক হিসেবে অনেকেই বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত) উচ্চশিক্ষার দ্বার খোলার বন্দোবস্ত এবং অনুমোদন পেল।

এরপর ৪/৮/৬৭ তারিখে PU, Arts B.A Pass Course নিয়ে ১৯৬৭-৬৮ সেশনে Senco's Godown-এ ২৩/৮/৬৭ তারিখের পুণ্য লগ্নে কলেজের নিয়মমাফিক কাজ শুরু হল। ২০/৯/৬৭ তারিখের চিঠির মাধ্যমে Eng, Beng, Hist, Eco, Civics, Logic, Com. Geography, Com. Arith matic ও Book Keeping বিষয়ের PU এবং Eng, Beng, Hist, Pol.Science, Economics, Philosophy, B.A. Pass -এর বিষয় হিসেবে যথাক্রমে PU Exam ১৯৬৮-তে, B. A. Part -I ১৯৬৯-এ B. A., Part - II ১৯৭০ সালে কলেজের প্রথম পরীক্ষা নেওয়ার অধিকারের অনুমোদন পাওয়া গেল।

২৮/৬/৬৭ তারিখে পরিদর্শক দলের রেকমেণ্ডশন অনুযায়ী Provisional G.B. হিসেবে যে সকল ব্যক্তি ও পদাধিকারীর নাম নথিভুক্ত আছে, তা হল ঃ

1. H.P. Bagchi, (S.D.O., Jangipur), 2. Radhanath Choudhury, 3. Lutfal Hoque (M.P.), 4. Dilip Kumar Das, 5. Anil Kumar Das, 6. Sarojakshya Bhattacharya, 7. Benoyendranath Das, 8. Saral Kumar Guha, 9. Tazamul Hoque, 10. B.K. Biswas (Principal), 11. T. R. (Two)—(a) Prof. Shyamsundar Bhattacharya 16.11.67, (b) Prof. Jati kumar Roy 16.11.67.

এখানে উল্লেখ্য যে Godown-এ Class করার জন্য শুধুমাত্র ১৯৬৭-৬৮ সেশনেই অনুমোদন ছিল এবং যথাযথ নিজস্ব গৃহ ইতিমধ্যে তৈরি না হলে ১৯৬৮-৬৯ সেশনে ভর্তি নেওয়ার উপরে নিষেধাজ্ঞাও ছিল।

যাইহোক, কলেজের বর্তমান বিল্ডিং সম্পূর্ণ হয়ে ১৯৬৮ সালের নভেম্বরে দ্বারোদ্ঘাটিত হয়। প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক ১১/১১/১৯৬৮ তারিখে বর্তমান ভবনের উদ্বোধন হয়। সেই সময়ের ক্লাসরুম হিসেবে ব্যবহৃত গোডাউন ছাত্রদের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য রাখা হল।

২/৮/৬৭ তারিখের G. B. মিটিং-এ (সম্ভবত: প্রথম) যে সকল কর্মচারী কলেজে যোগদান করেন, তাঁরা হলেন—

| | |
|---|---|
| 1. Sri Dibakar Pal | H C Cum Accountant 1.7.67 |
| 2. Sri Rakhahari Mukherjee | Cashier Cum Clerk 1.7.67 |
| 3. Sri Santosh Kr. Sarkar | Asst. Librarian 16.08.67 |
| 4. Sri Narendranath Barik | Principal's Bearer 19.7.67 |
| 5. Nazrul Islam | Bearer 16.8.67 |

৩১/৮/৬৭ তারিখের মিটিং-এ অনুমোদন পেলেন—

| | |
|---|---|
| 1. Prof. Sudharanjan Sengupta - | English 16.8.67 |
| 2. Prof. Biswanath Roy - | Bengali 16.8.67 |
| 3. Prof. Dhirendranath Biswas - | History 16.8.67 |
| 4. Prof. Shyamsundar Bhattacharya - | Pol. Sc 16.8.67 |
| 5. Prof. Jagabandhu Mandal - | Commerce 16.8.67 |
| 6. Prof. Shanti Ranjan Pandey - | Philosophy 23.8.67 |
| 7. Prof. Jati Kr. Roy - | Economics 29.8.67 |

৩১.৮.৬৭ তারিখের G. B. Meeting-এ যে বিল্ডিং কমিটি তৈরি হয়, তার তালিকা ঃ

১। শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস, ২। শ্রী কানাইলাল শেঠি, ৩। মুন্সি ইদ্রিশ আহমেদ, ৪। শ্রী দিলীপ কুমার দাস, সেক্রেটারি, ৫। শ্রী বিজনকান্তি বিশ্বাস, প্রিন্সিপ্যাল।

Founder Member হিসেবে যাদের নাম উল্লিখিত রয়েছে, তাঁরা হলেন ঃ

১. শ্রী অজিত কুমার মুখার্জী, ২. হাজি লুৎফল হক, ৩. শ্রী সরোজাক্ষ ভট্টাচার্য, ৪. শ্রী নীহার কুমার চৌধুরী, ৫. শ্রী অনিল কুমার সান্যাল, ৬. শ্রী জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, ৭. শ্রী ব্রজগোপাল সরকার, ৮. শ্রী সুধাংশু শেখর সরকার, ৯. শ্রী নরেন্দ্রনাথ সাধু, ১০. শ্রী হৃষিকেশ দাস, ১১. শ্রী কানাইলাল শেঠি, ১২. শ্রী লক্ষ্মীপতি চৌধুরী, ১৩. শ্রী বিজয় কুমার সরকার, ১৪. মহ: তাজামুল হক, ১৫. শ্রী দেবীদাস মুখার্জী, ১৬. শ্রী ঘিশুলাল শেঠি, ১৭. শ্রীমতী মায়া দাস, ১৮. শ্রী অবনী কুমার দাস, ১৯. শ্রী অনিল কুমার দাস, ২০. শ্রী দিলীপ কুমার দাস, ২১. শ্রী সমরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, ২২. মহ: বেলালউদ্দিন, ২৩. শ্রী সরল কুমার গুহ।

যাঁরা এককালীন কমপক্ষে ১০,০০০ টাকা কলেজ ফাণ্ডে দান করেছেন, তাঁদের নাম দাতা-মেম্বার হিসেবে উল্লিখিত রয়েছে।

১. শ্রী অশ্বিনী কুমার দাস, ২. শ্রী অনিল কুমার দাস, ৩. শ্রী দিলীপ কুমার দাস, ৪. শ্রী দিপ্তীকুমার দাস (এমবিএম কোং), ৫. শ্রী অসীমকুমার দাস (এমবিএম কোং), ৬. মেসার্স অম্বালাল আশাভাই প্যাটেল এবং ভ্রাতাগণ গুজরাট, ৭. মেসার্স মগনভাই জেচাভাই প্যাটেল ও কোং, গুজরাট, ৮. মেসার্স দোশী রণভি ও কোং,মহীশূর, ৯. জঙ্গিপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন।

আমি কলেজে জয়েন করি ১৯৮৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর। কিছুদিন পরে শুনেছি, ওই শিক্ষকের পদটি বাণিজ্য বিভাগের প্রথম পদ যা সকলের প্রিয় অধ্যাপক জগবন্ধু মণ্ডলের (যিনি ১৯৮৬ সালের জুন মাসে অকালে প্রয়াত) ছেড়ে যাওয়া আসন। ভীষণ ভয় ও শঙ্কা ছিল তখনকার মাত্র ২৫ বৎসর বয়সের এই অনভিজ্ঞ অধ্যাপকের। যাইহোক, প্রথম দিকে অসুবিধা হলেও, জেদের বসে নিজেকে তৈরি করার চেষ্টা করেছি এবং প্রায় ৩১ বৎসরের শিক্ষকতায় অনেক ছাত্রছাত্রী পেয়েছি যারা এখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে বজলুল, বিহঙ্গ, দেবাশীষ, অনুপ, দীপক, সাহাবুদ্দিন, কাজল, সুমিত, ধ্যানেন্দু, আনওয়ারুল, স্বরাজবন্ধু প্রমুখ আরো অনেকে, এক্ষণে নাম মনে পড়ছে না।

আমি কলেজে জয়েন করার পর চার মাস থেকে এক বছরের মধ্যে আরও চার জন অধ্যাপক, রাখহরি পাল, সনৎ দাস, তপন কুমার কর্মকার ও নিশিকান্ত পাল যথাক্রমে অংক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ের অধ্যাপক পদে জয়েন করে। তারা আমার মতো আনকোরা নয়। স্কুল শিক্ষকের পদ ছেড়ে কলেজে এসেছিল। সনৎ দাস ২০১০ সালের মে মাসে গোবরডাঙ্গা কলেজে ট্রান্সফার নিয়েছে। বাকীরা অবসরপ্রাপ্ত। যেটা উল্লেখনীয় তা হল আমরা একসঙ্গে যে যার মতো থাকলেও, কিছুদিন পরে অর্থাৎ বছর খানেক পরেই আমরা ধরবাড়িতে মেস করে থাকতে লাগলাম। সেই সময় আমরা সকলেই ব্যাচেলর। অনেক স্মৃতি সেই সকল দিনগুলিতে জড়িয়ে আছে। এখানে সেসবের বিবরণ দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও কলেবর বৃদ্ধি অবাঞ্ছিত বিবেচনায় শুধু কয়েকটি বিষয় না বলে থাকতে পারলাম না। অনেক দাদা শিক্ষক এমনকি অধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের 'পঞ্চ পাণ্ডব' বলতেন। এইভাবে প্রায় ৫ বছর অতিবাহিত করে একে একে বিবাহিত হয়ে মেসে একসঙ্গে থাকাটা পরিসমাপ্তি ঘটে। তারপর বিভিন্ন জায়গায় বাসা হলেও আমাদের আড্ডা হতো সেই শেখরদা, বিদ্যাপতি দা, সুনীল সেনগুপ্ত দা, কিশোর দা, গুপি দা, প্রমুখের সঙ্গে কোনো একজনের বাসায়। তার সঙ্গে ছিল, প্রথম দিকের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও ইনচার্জ, ধীরেনবাবু, শান্তিদা, অজিত দা, তপেন দা, সন্তোষ ভট্টাচার্য দা, প্রমুখের বাসায় মাঝে মাঝে। সেই সকল স্মৃতি আজ ধূসর। বর্তমানে আমি একঝাঁক প্রবীণ, মাঝবয়সী ও নবীন অধ্যাপকদের মাঝে এবং ১৫ জন মাঝবয়সী ও তরুণ শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের ন্যায় আবার গত ১ জুলাই থেকে অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছি। সকলের সহযোগিতায় বিশেষ করে ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তনী ও পরিচালক মণ্ডলীর সহায়তায় কলেজের পঠন-পাঠন, পরিকাঠামো উন্নয়ন, নতুন নতুন বিষয় সংযোজন, স্নাতকোত্তর বিষয়ের প্রবর্তন প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার বিষয়গুলি নিয়ে কলেজ এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা করি।

বহু উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এই প্রতিষ্ঠান আজ বহু শাখা-প্রশাখায় বিকশিত হয়েছে। ভবিষ্যতের সুদূর-প্রসারিত পথে আবার তার যাত্রা শুরু হল। এমনিভাবে একদিন এই প্রতিষ্ঠান শতবর্ষের দোরগোড়ায় গিয়ে পৌঁছাবে— এই স্বপ্নকে বুকের মধ্যে লালন করে যাব আমরা। ■

'ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ।'

—আল-কোরআন

# স্মৃতির মালিকা গাঁথি

## অধ্যাপক সাধন কুমার দাস

তখন তার কৈশোর, আমার যৌবন। এখন তার যৌবন, আমি মধ্যবয়স-অতিক্রান্ত প্রৌঢ়। দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজ আর আমি—দু'জনের এই অচ্ছেদ্য গাঁটছড়া আজ আঠাশ বছরের। প্রায় তিনদশক। আমার সৌভাগ্য যে এই প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী আর সুবর্ণজয়ন্তী—দুটি বড় মাইলস্টোনই আমার কর্মকালের পরিসরের মধ্যেই অন্তর্লগ্ন হয়ে রইলো। কলেজে যোগদানের চার বছর পর '২৫ বছরের উৎসব' আর অবসরের চার বছর আগে '৫০ বছরের উৎসব'। মাঝখানে গঙ্গা-পদ্মা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। শুরুর দিন থেকে আজ পর্যন্ত কতো প্রিয় মুখের অবসর দেখলাম। কতো ফুলকে অকালে ঝরে যেতে দেখলাম, কতো প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেলাম, আজ তার হিসাব করবে কে? যাঁদের কথা ভেবে, যাঁদের টানে, অন্য কলেজে (বিশেষ করে জঙ্গিপুর কলেজে) চলে যাবার কথা কোনোদিন ভুলেও ভাবিনি, তাঁরা নিজেরাই কখন যে আমাকেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে, খেয়াল করিনি কোনোদিন।

লবণচোয়া গ্রাম থেকে ২৯ বছরের এক যুবক এমনি এক ভাদ্রের ভরা বর্ষায়, সাইকেলে তিন-চতুর্থাংশ পথ জলকাদা ভেঙে ১৬ কিলোমিটার উত্তরে ডি. এন. কলেজে বাংলার অধ্যাপক হিসেবে জয়েন করতে এসেছিল। কলেজের বয়স তখন ২২ বছর। সামনের বারান্দায় ছিল কোমর সমান রেলিং আর পুরো লনটা ছিল মাটির। বর্ষার জলে তা শ্যাওলা-পিছল হয়ে পড়ায় পা টিপে টিপে চলতে হতো। অনেকে সেই লনে পা পিছলে আছাড়ও খেয়েছেন। ধীরেনদা (অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস) ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ। জালালদা ছিলেন টাইপিস্ট। জালালদার হাতে টাইপ করা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে সেই যে আড়াই যুগ আগে এই কলেজে ঢুকেছিলাম, আজও সেই কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে।

আমি যখন এই কলেজে যোগদান করি, তখন তার চেহারায় ও চলনে আদিপর্বের কিছুটা ছোঁয়া রয়ে গেছে। তবে লোডশেডিং হলে হ্যাচাক জ্বালিয়ে, নাইট কলেজের কমার্স ক্লাসের অভিনব আস্বাদ আমরা পাইনি। রাতের কমার্স তখন সকালে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।

কলেজে তখন রমরমিয়ে চলছে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস। অতবড়ো ৩ নম্বর ঘরে ছাত্র-ছাত্রীরা দরজার বাইরে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতো। রীতিমতো একটা জনসভা। ক্লাসে যাবার আগে ভয় ভয় করতো। তখন কমার্স ছাড়া আর্টসের শুধুমাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স ছিল। ১৯৯৮ সালে বাংলা অনার্স খোলা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। ঠিক তার পরের বছরই (১৯৯৯) আমাদের কলেজ সহ মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ার সমস্ত কলেজগুলি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে যায়।

সে সময় ছাত্রসংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বিস্তর ঝামেলা হতো। কলেজ ছাড়িয়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় জন সাধারণের মধ্যে কলেজ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এত উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়তো, এত হিংসা ও হানাহানি সৃষ্টি হতো যে মনে হতো, লোকসভা-বিধানসভা ভোটেও এমনটা হয় না। আমার মতো দুর্বলপ্রাণ অধ্যাপকেরা মনে মনে ভাবতো যে এই দিনটি পার হয়ে গেলে আরও একবছর চাকরি করতে পারব। বোমা-গুলি আর মারপিটের আতঙ্কে শান্তিপ্রিয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা (বিশেষ করে ছাত্রীরা) ভোটের আগে ও পরে দীর্ঘ দিনই কলেজ আসতো না।

তৎকালীন অধ্যক্ষ তাপস ব্যানার্জী ২০০১ সালে তিনটি যুগান্তকারী ও সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন : (১) বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ছাত্রসংসদ নির্বাচন তুলে দেওয়া, (২) কমার্সের মর্নিং শিফ্‌ট্‌-কে ডে'র সঙ্গে মার্জ করে দেওয়া এবং (৩) সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগেই কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পঠন-পাঠন তুলে দেওয়া। এরফলে কলেজে শান্তি ও সুস্থিরতা অনেকটাই ফিরেছিল এবং পঠন পাঠনে একটা সংহতি এসেছিল। মাঝে মাত্র কয়েকবছর ছাড়া। এই কলেজে স্থায়ী অধ্যক্ষ দীর্ঘ বছর ধরে নেই বলে কলেজের প্রত্যাশিত ও পরিকল্পিত উন্নতি সম্ভব হয়নি।

পঞ্চাশ বছরের মধ্যে প্রথম ২৫ বছর অধ্যাপকেরা কলেজের

কাছাকাছি ভাড়া নিয়ে বা মেস করে থাকতেন। ফলে কলেজটাই হয়ে উঠেছিল তাদের ঘরবাড়ি। এখন যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা ভালো হওয়ায় এবং মানুষের সময়যাপন ব্যস্ততর হওয়ায় অনেকেই দূরদূরান্ত থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন।

কলেজের আদিপর্বে যাঁরা ছাত্রছাত্রী ছিলেন, তাঁদের ছেলেমেয়েরা এখন এই কলেজের ছাত্রছাত্রী। সকলের কাছেই 'স্মৃতি সততই সুখের'। এই কারণে অনেক অভিভাবককে তাঁদের সময়কার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, আন্তরিক পরিবেশের সুখ্যাতি করতে শুনেছি। এখন নাকি সমস্ত ক্ষেত্রেই কলেজের অধোগতি হয়েছে। সবিনয়ে বলি, একথা সর্বাংশে সঠিক নয়। ভোগবাদী সময় ও সমাজের কিছুটা আবিলতা যে ঢোকেনি, তা নয়। তবে এখনো এমন শিক্ষক আছেন, এমন ছাত্রছাত্রীও আছে—যারা একই পরিবারের মতো আমাদের সংসারে তিনটি বছর কাটিয়ে যায়। তারাও হয়তো আরও পঞ্চাশ বছর পরে তাদের অভিভাবকদের মতোই একদিন বলবে—'আমাদের কলেজ জীবনটা কতো ভালো ছিল।'

কলেজের প্রথম যুগে ছাত্রছাত্রী ছিল হাতে গোণা। এখন প্রতি বছর দেড় হাজার দু'হাজার ছাত্রছাত্রী কলেজে ভর্তি হয়। তাই প্রত্যেকটি ছাত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত নৈকট্য তৈরি করা আজকের শিক্ষকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা থাকে বিভাগীয় শিক্ষকদের নখদর্পণে আর জেনারেল কোর্সের কিছু মেধাবী ও আগ্রহী মুখ শিক্ষকদের সান্নিধ্যে আসে।

আঠাশ বছরে অনেক মুখ, অনেক কোলাহল-কলরব, অনেক স্মৃতি। মনে পড়ছে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও মঞ্জুরদার সঙ্গে আমার মধুর বন্ধুত্ব। রাখোদার সঙ্গে আমার হারানো দিনের কতো গান, কবিতা আর বেতার নাটকের আলোচনা।

আমি কলেজে যোগদানের পর মাত্র ছ'মাস খুব অনিয়মিতভাবে দেখেছিলাম ইংরেজির অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়কে। তারপর একদিন শুনি, উনি গঙ্গার জলে ডুবে গেছেন। তবে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শুধু তাঁর ব্যবহৃত জুতো ও লাঠিখানা জলের ধারে পড়েছিল। ইংরেজির আরেক অধ্যাপক গোপীশ্বর বিশ্বাসও বিনা নোটিশে একদিন চলে গেলেন। বিকেলবেলা স্টাফরুমে সকলের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি তর্কবিতর্ক করছেন দেখে বাড়ি ফিরলাম, পরদিন সকালে কলেজে এসেই শুনলাম জি. বি. আর নেই!! ইংরেজি বিভাগেরই জনপ্রিয় তরুণ অধ্যাপক প্রতনু দত্ত বাড়ির কাছের কলেজে (হুগলী) চলে যাওয়ার কিছুদিন পরেই শুনলাম সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ—প্রতনু আত্মহত্যা করেছে। একসঙ্গে সকলে মিলে শিবগাছি যাওয়া, পাহাড়ে ওঠার স্মৃতিগুলো তখনও টাটকা, জীবন্ত।

জগবন্ধু বাবুকে আমি দেখিনি। বণিজ্য বিভাগের এই মানুষটি নাকি সকলের খুব প্রিয় ছিলেন। খুব কষ্ট পেয়ে ক্যান্সারে মারা যান। তাঁর স্ত্রী কলেজের লাইব্রেরিতে দীর্ঘকাল চাকরি করে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। পরবর্তীকালে জগবন্ধুর পোষ্টে এসেছিল আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম বিশ্বজিৎ— বিশ্বজিৎ সিংহ। একদিন কথায় কথায় বিশ্বজিৎ জগবন্ধুর স্ত্রীকে বলছেন— 'শুনেছি, দাদা নাকি ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিলেন। আমিও দাদার কাছে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করবো বৌদি।' ভাগ্যের কী পরিহাস! সেই বছরেই ক্যান্সারে আক্রান্ত হল বিশ্বজিৎ এবং এক বছর পর আমাদের সবাইকে ছেড়ে, তার কথামতো জগবন্ধুবাবুর কাছে সেই আজানা ঠিকানাতেই পাড়ি দিলো। বিশ্বজিতের কথা আমি আজও ভুলতে পারি না। শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে অকালে চলে গেছে আনোয়ার, সঞ্জয়। অবসরের পর পরিণত বয়সে চলে গেছেন অনেকেই।

১৯৮৯ সালে আমি যখন জয়েন করি, তখন বাংলা বিভাগে ছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক ড. সুনীল সেনগুপ্ত। খুব মজাদার মানুষ ছিলেন। আড্ডার টেবিলে একজন নিখাদ মানুষ। কলেজের অদূরে একই মেসে থাকতেন অর্থনীতি বিভাগের ড. কিশোরকুমার রায়চৌধুরী, বাণিজ্য বিভাগের বিদ্যাপতি হালদার আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শেখরেন্দ্র চন্দ্র সেন। কিশোরদা অর্থনীতির মানুষ হলেও নানান বিষয়ে ছিল আগ্রহ ও গভীর রসবোধ। বিদ্যাদা জানেন না — বিশ্বসংসারে এমন কোনো বিষয় ছিল না। শেখরদা ছিলেন অতিথিবৎসল। কলেজের যে-কোনো অনুষ্ঠানের গৃহকর্তার মতো অতিথি আপ্যায়ন করতেন উনি।

আমার জয়েন করার দু'বছর বা তিন বছর আগে যোগদান করেন বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিখিলেন্দু বিকাশ দাস, গণিতের রাখহরি পাল (পরে উনি মেদিনীপুরের মানিকপাড়া কলেজে চলে যান এবং অবসর গ্রহণ করেন), পদার্থ বিদ্যার নিশিকান্ত পাল এবং রয়াসনের তপনকুমার কর্মকার। শেষোক্ত দু'জনেই অবসরপ্রাপ্ত।

আমার সমবয়সী (একই সময়ে দুজনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অশুতোষ বিল্ডিং-এ ক্লাস করেছি) এবং খুব প্রিয় বন্ধু সনৎ দাসের সঙ্গে অনেকদিন একই সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু কয়েক বছর আগে যখন সনৎ এই কলেজ ছেড়ে গোবরডাঙা কলেজে চলে যায়, তখন বাস্তবিকই আমি খুব শূণ্য হয়ে যাই। রাখোদা যাওয়ার পরও এই শূণ্যতা আমি অনুভব করেছি এবং এই শূণ্যতা আজও আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

স্থানাভাবে অনেক নাম উল্লিখিত হল না। তাঁরা সকলেই আমার একান্ত আপনজন। কাউকে আজও ভুলিনি। পুরনো প্রজন্মকে 'স্মৃতিসিন্ধুকে' তুলে রেখে এখন নতুন প্রজন্মের একঝাঁক তরুণ বন্ধুর সঙ্গে ঘর করছি। বেশ লাগছে। সময়ের সঙ্গে কীভাবে বদলে যায় প্রতিষ্ঠানের মানুষজন, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের চরিত্র— তা খুব স্থিরদৃষ্টিতে লক্ষ করছি। কলেজের এই প্রবহমান ধারাস্রোতে এতটা পথ পার হয়ে আসার পর আমিও বদলে যাচ্ছি? কে জানে! ■

# পুরানো সেই দিনের কথা

**মহ. নুরুল ইসলাম** *(গ্রন্থাগারিক)*

১৯৬৭ সাল, ২৩শে আগস্ট, বুধবার। জ্যোতির জাগরণ হলো। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সূচিত হলো এক নতুন দিগন্তের।

শ্রদ্ধেয়, স্বর্গতঃ দুঃখুলাল ও নিবারণ চন্দ্র দাস, দুই মহান শিল্পপতি মহোদয়ের পরিবারবর্গের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এবং স্বর্গতঃ শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক লুৎফল হক সাহেবের প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া, গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া প্রত্যন্ত অঞ্চলে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে অসীম শূন্যতাকে বিদীর্ণ করে জ্বলে উঠেছিল এক মহিমাময় 'আলোক দীপ্তি'। মুর্শিদাবাদ তথা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে উচ্চ শিক্ষার আঙিনায় আরও একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের নাম সংযোজিত হয়েছিল।

হে বীর, সমাজসেবী, দরদীদ্বয় তোমাদের নামাঙ্কিত শিক্ষার অভিপ্রায়, আদর্শ ও মহিমা শুধু দিকে দিকে নয়, দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে। বলাবাহুল্য, অনেক সুজ্ঞানী-পণ্ডিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এই শিক্ষালয়টিতে শিক্ষাদান করেছেন এবং পাঠদানে রত আছেন।

এই মহাবিদ্যালয়ের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অধ্যাপকদের উদার, শিক্ষাসুলভ চারিত্রিক গুণাবলী, বৈশিষ্ট্য ছাত্র-ছাত্রীদের মনের ওপর সুপ্রভাত ফেলে, তাদের জীবনের গতিকে ত্বরান্বিত করেছে। বহু প্রতিভাধর, কীর্তিমান ছাত্র-ছাত্রী এই শিক্ষা প্রাঙ্গন থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চাসীন হয়েছে। যারফলে, এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে যা আজকের দিনেও অক্ষুন্ন রয়েছে।

আমি এই কলেজের ছাত্র নই বটে, কিন্তু বি.কম. (অনার্স) এর ভর্তি ফর্ম জমা, ফিলাপ করেছিলাম তা তো ঠিক। ছোটবেলায় দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্রের নামাঙ্কিত একখানি বই দেখেছিলাম। যতটুকু মনে পড়ে, সম্ভবতঃ বইখানির শিরোনাম ছিল—'কর্মবীর দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র'। বইখানির উপরের পাতা অর্থাৎ শিরোনাম পৃষ্ঠা (Title Page) খয়েরি (Pillow Colour) রং এর ছিল। লেখকের নামও আমার মনে নেই। মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর তরফ থেকে কোনো ব্যক্তি ধুলিয়ান, নতুন লাইব্রেরিতে, স্বর্গীয় পিতা আনিগুর রহমানের কাছে দিয়ে এসেছিলেন। আমার বয়স হয়তো তখন নয়-দশ বছর হলেও বইখানি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েছিলাম। তার একটি লাইন আজও এক-আধটু মনে পড়ছে, তা হলো—'নিতান্তই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে দুঃখুলাল বড়ো হয়েছিলেন।' আমাদের বাড়িতে বইখানির কপি ছিল। কিন্তু কোথাও Misplacement হয়ে কপিখানি খোয়া গেছে।

আমার পূর্বের কর্মস্থল ছিল ফরাক্কায় প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজ। আমি গ্রামের বাড়ি ধুলিয়ানের বাবুপুর থেকে প্রতিনিয়ত ফরাক্কায় কখনো বাসে, কখনো ট্রেনে যাতায়াত করতাম। যাতায়াতের পথে বল্লালপুরে খুব রাস্তা জ্যাম হতো। তারপর আবার বল্লালপুর ব্রীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের পথে যাতায়াত ব্যবস্থায়, বল্লালপুরে রোড জ্যাম দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে পড়ে। যার ফলে, আমি একটা সময় ফরাক্কায় থাকতে আরম্ভ করলাম। প্রথমে বাড়িভাড়া নিয়েছিলাম NTPC মোড়ের সন্নিকটে নির্মল প্রকৃতির বুকে চৌকিগ্রামে।

মা আমার কাছে থাকত। তার শরীর অসুস্থ ছিল। চৌকিগ্রামের বাড়িটির ঘরগুলো ছোট ছিল। যার ফলে, অসুস্থ 'মা' এর জন্য একটা ভালো বাড়ি খুঁজছিলাম। মা-এর জন্য ভালো বাড়ি পেলাম মোস্তাফা কমপ্লেক্সে। চৌকিগ্রামের বাড়িটিতে ১৩ মাস ভাড়া থাকার পর ২০০৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি বাড়ি বদল করে খয়রাকান্দির মোস্তাফা কমপ্লেক্সের ভালো বাড়িতে উঠে গেছিলাম।

শীতকাল, মাঘ মাস। চৌকিগ্রামের আম বাগানের দিকে তখনো

সূর্য অস্ত যায়নি। একটি ভ্যানে আমরা উঠে বসবার সময় প্রথমে মাকে ভ্যানে বসাতে গিয়ে, মা ফুঁপিয়ে, ফুঁপিয়ে ঝরঝর কাঁদতে আরম্ভ করল।

দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই আমরা নতুন ভাড়া বাড়িতে গিয়ে পৌঁছালাম। সেইদিন 'মা' রাত্রের আহার গ্রহণ করে ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে বুঝলাম তাঁর শরীর খারাপ। রাত্রিবেলায় ডাক্তারের কাছে গেলেন না, কিছুক্ষণ সেবা-শুশ্রূষাও দেওয়া হলো। সকালে ডাক্তারের কাছে যাব বলে ঘুমিয়ে গেল। আমি দ্বিপ্রহর রাতে মায়ের শরীরে হাত দিয়ে দেখলাম—সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মা আর নেই, চলে গেছে। ২০০৭ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি মাঘ মাসের পূর্ণিমার সকালে মৃত মাকে বাড়ি নিয়ে এলাম এবং সন্ধ্যার পর, আমাদের ডিহি বাগানে বাবার সমাধির পার্শ্বে সমাধিস্ত করলাম। বাবা, তার আগেই ১৯৯৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর রাস পূর্ণিমার সকালে বাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছিলেন এবং সন্ধ্যার পর সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

তারপর থেকেই আমার মন-হৃদয় বাড়ি আসতে চাইল। তাই, পূর্বের কর্মস্থল প্রফেসর সৈয়দ নুরুল হাসান কলেজে, নয়-বছর অতিবাহিত করে, West Bengal College Service Commission-এ নতুন করে interview দিয়ে ২০০৮ সালের ১লা অক্টোবর আমার বর্তমান কর্মস্থল ডি. এন. কলেজে যোগ দিয়েছিলাম।

২০০৯ সালের ১৪, ১৫, ১৬-ই সেপ্টেম্বর 'University Grant Commission' এর দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা যাচাই করনের 'NAAC Peer Team'-কে আমাদের ডি. এন. কলেজ পরিদর্শন করবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তৎকালীন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নির্মলেন্দু বিকাশ দাস মহাশয়ের নেতৃত্বে, আমরা 'NAAC Pear Team'-এর মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাদের মহাবিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে 'B Grade' পেয়েছিল।

২০১০ সালের ১১ই জুলাই, জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৎকালীন ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রী, মহামান্য বিদায়ী রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁর সংসদীয় এলাকায় এসেছিলেন এবং আমাদের দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ ও কলেজ লাইব্রেরি পরিদর্শন করেছিলেন।

২০১৬ সালের নভেম্বর মাসের ১৫, ১৬, ১৭ তারিখগুলি ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্যামল কুমার মণ্ডল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরা 'NAAC Pear Team'-এর মুখোমুখি হয়েছিলাম এবং পুনরায় 'B Grade' পেয়েছি।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো, মনের ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশ এবং এর উপায় প্রাণহীন অনুকরণ নয়। এর উপায় স্বতঃস্ফূর্ত ঔৎসুক্য ও আত্মানুশীলন, যা মানবজাতির এক ব্যক্তি হিসেবে, প্রত্যেক মানুষের বা ব্যক্তির মধ্যে মানবতার প্রকাশ পাবে।

শিক্ষার লক্ষ্য শুধু কতকগুলি নির্দিষ্ট তথ্য জ্ঞাপন করা নয়, ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে যথার্থ সামাজিক পথে পরিচালিত করাই হলো শিক্ষার লক্ষ্য। অর্থাৎ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো, সভ্য নাগরিক (Civilize Citizen)। সুস্থ সমাজ (Well Society) এবং মহান জাতি গড়ে (Great Nation Build) তোলা। সেটা গড়ে তুলতে আমাদের মহা বিদ্যালয়টি এই এলাকায় ব্যাপক সহায়তা করেছে।

শিক্ষালয়টির ছাত্র-ছাত্রী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কলেজে নতুন বিষয়—যেমন, শারীর বিদ্যা, ভূগোল ও জীববিদ্যার শাখা বেশ কয়েক বৎসর থেকেই চালু হয়েছে। ফলে, মহাবিদ্যালয়টির কলেবর শ্রীবৃদ্ধি পেয়েছে।

দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি মাননীয় মোস্তাক হোসেন সাহেবের পরিচালনায় ও বিভিন্ন ভাবে সহায়তার মাধ্যমে কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

এই এলাকার অনেক বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন সময়ে নানান ধরনের বুদ্ধি ও সুপরামর্শ দিয়ে মহাবিদ্যালয়টি পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করেছেন।

মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের দূর-দূরান্তের জেলাগুলি থেকে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ এখানে চাকুরী করতে আসেন। আমার মনে হয় কলেজ কর্তৃপক্ষ যদি শিক্ষকদের জন্য স্থায়ী আবাসন গড়ে তোলেন, তাহলে খুব ভালো হয়।

মহাবিদ্যালয়টিতে যদি কিছু আরও নতুন শাখা খোলা হতো এবং বিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স চালু করা যেত, তবে ছাত্র-ছাত্রীরা খুব উপকৃত হতো।

বিশ্বায়নের গতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আরও মানোন্নয়ন ঘটুক এবং বহুমুখী সার্বিক বিকাশ হউক, যা শিক্ষা ও পাঠদানের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে উঠুক সেটাই কাম্য। ■

'আত্মহত্যা জীবনের সবচেয়ে কাপুরুষতার পরিচয়।'

—আল-কোরআন

# ডি. এন. কলেজের প্রথম পর্বের দিনগুলি

## অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়

১৫ই আগস্ট, ১৯৬৭; সন্ধ্যার কিছু পরে ট্রাম চলেছে হাওড়া স্টেশনের দিকে। আলো ঝলমলে লেক এভিনিউর দিকে চোখ পড়ল তার, ছেড়ে যাওয়া স্কুলটির দিকে, যেখানে তিন বছরের শিক্ষকতার পর ছাব্বিশ বছরের জীবনটি চলেছে দূর মুর্শিদাবাদের প্রান্তে, কলেজে শিক্ষকতা করবে বলে। ভোর ফুটলে নিমতিতা স্টেশনে নেমে দেখা পেল টাঙ্গা, যা আগে কেবল চলচ্চিত্রে দেখেছে, ভাষা বাংলা হলেও তার উচ্চারণ ভিন্নতর। রিক্সায় উঠতে গিয়েই পরিচয় আর একজনের সঙ্গে। তিনিও চলেছেন যোগ দিতে একই কলেজে।

কলেজের ক্লাস শুরু হয়নি। উদ্যোক্তাদের অতিথিশালায় রিক্সা পৌঁছল। মনে আছে, অরঙ্গাবাদ শুনে প্রথমে মনে হয়েছিল কোনো উত্তর প্রদেশিয় জায়গা। কিন্তু এখানে আসার পথে 'ব্যাংডুবির মাঠ' শুনে আশ্বস্ত হওয়া গেল। অধ্যক্ষ আগেই যোগ দিয়েছিলেন। শিক্ষকতার দীর্ঘ প্রায় চার দশকে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নানা গুণের অধিকারী এই অসামান্য মানুষটির মতো দক্ষ প্রশাসক অথচ হৃদয়বানের আন্তরিক স্পর্শ লাভ করিনি। তিনি শ্রী বিজনকান্তি বিশ্বাস। কলেজটির সূচনা থেকে দু'বছরের কিছু বেশি সময় বোধহয় ছিলেন। তার মধ্যেই সুনিশ্চিত দৃঢ় ভিত্তি গড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের।

১৬ই আগস্ট, ১৯৬৭। আমরা পাঁচজন শিক্ষক যোগ দিলাম। ইংরাজির সুধারঞ্জন সেনগুপ্ত, ইতিহাসের ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য, বাণিজ্যের জগবন্ধু মণ্ডল আর বাংলার আমি। দুপুরে দাশ কোম্পানির অতিথিশালায় ইলিশ সহযোগে আহারের পর, বাজারের মধ্যে একটি বাড়ির দোতলায় যাওয়া গেল। তিনটি ঘর নিয়ে আমাদের মেসবাড়ি। উঠেই প্রথম ঘরে আমি আর সুধারঞ্জন। যতদিন অরঙ্গাবাদে ছিলাম, এটিই ছিল আমার আবাস। সব ছাড়িয়ে মনে পড়ে, জানলা দিয়ে দেখা নীচের মিষ্টির দোকানে কড়াইয়ে ভাসমান বিপুলাকৃতি রাজভোগ, আর কাঠের থালায় স্বাস্থ্যবান চমচমেদের (এদের স্থানীয় বিশেষ নাম ছিল, আজ আর মনে নেই)। মিষ্টি শুধু জিভেই পাইনি; পেয়েছি বহু সম্পর্কেও। তবে তার মধ্যে বিশেষ বন্ধু হয়ে উঠেছিল আমার সম্বোধনে 'জগ',—ছাত্রদের অতি প্রিয়, বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক জগবন্ধু মণ্ডল। এ বয়সে এতদিন পরেও তাঁর অসময়ে চলে যাওয়ার স্মৃতি, বেদনা দেয়।

২৩শে আগস্ট, ১৯৬৭; বাজার থেকে কিছু দূরে একটি লম্বা গুদাম ঘর সংলগ্ন মাঠে সামিয়ানার নীচে কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো বিকাল বেলায়। যতদূর মনে পড়ে, জিয়াগঞ্জ কলেজের সে সময়ের অধ্যক্ষ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। পরদিন, ২৪শে আগস্ট থেকেই সেই গুদাম ঘরটিকে কয়েকটি অস্থায়ী দেওয়াল দিয়ে ভাগ করে, ক্লাস শুরু হয়ে গেল। অধ্যক্ষ বিশ্বাসের নানা কুশলী কর্মের মধ্যে মনে পড়ে সেই অস্থায়ী আবাসের অসুবিধা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার শুরু করে দেওয়া।

একেবারে শুরুতে অফিসে প্রধান ছিলেন দিবাকরবাবু, সঙ্গে রাখহরিবাবু। আর নানা কাজে সহকারী হয়ে এসেছিলেন নরেন্দ্রনাথ বারিক আর নজরুল ইসলাম। এছাড়া মনে পড়ে সে বছরই, পরে এসে যোগ দেন অর্থনীতি বিভাগের জ্যোতিকুমার রায় আর দর্শন বিভাগে শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে।

পরের বছর ১৯৬৮ সালে, বাংলা বিভাগে আসেন নুরুল ইসলাম মোল্লা আর ইংরাজি বিভাগের বিশ্বনাথ রায়। একই কলেজে একই নামের দু'জন থাকায় যে কত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা লিখতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ হবে। শুধু এটুকু বলি, ইংরাজির বিশ্বনাথ বাবুর অকাল প্রয়াণের পরে কারও কারও ধারণা হয়েছিল,

আমিই চলে গেছি। যাই হোক, ইংরাজির বিশ্বনাথ আর ভাই নুরুল মিলে একটি সাময়িক পত্রিকা—'অরঙ্গাবাদ বার্তা' কিছুদিন আগে প্রকাশ করেছিলেন।

এভাবে লিখতে থাকলে, স্মারক গ্রন্থের সবটা জায়গা নিয়ে নেবে, তাই অনেকের কথা না-বলা রইল; অবশ্য অনেকের মুখ, চোখের সামনে আসলেও নাম ভুলে যাওয়ায় অতৃপ্তিও বোধ করছি।

আমরা শিক্ষকেরা, সকলেই অধ্যক্ষকে 'স্যার' বলতাম, সহবতের জন্য নয়; তাঁর ব্যক্তিত্বই সেটা দাবি করত। আর আমরা ছাত্রতুল্যই ছিলাম। সম্ভবত, ধীরেনবাবু ওঁর ছাত্রই ছিলেন। স্যারের চেষ্টায়, দ্রুতই কলেজ বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল, আর তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষও হলো। অরঙ্গাবাদ ছাড়িয়ে এ কলেজের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তরবঙ্গে, এমনকি পাশের বিহার প্রদেশেও। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ হওয়ার জন্য সেখান থেকেও ছাত্ররা আসতে লাগল। আর কলেজ বাড়ির উদ্বোধনে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী সত্যেন সেন এলেন, সে সময়ের প্রেক্ষিতে ব্যাপারটা—জয় জয়কার।'

ছাত্র-ছাত্রীদের কথা কিছুই বলা হলো না। তবে একটা বিষয় ভোলার নয়। যতদিন অরঙ্গাবাদে ছিলাম, রাস্তায় হাঁটলে কিছু সময় পর পিছন ফিরে তাকাতে হতো। প্রথমদিকে কিছুটা বিস্ময় বোধ হতো, পরে স্বাভাবিকভাবেই নেওয়া যেত। তা হলো, ছাত্ররা কখনোই শিক্ষককে পার হয়ে যেত না, যতক্ষণ না শিক্ষক বলতেন—যাও। চশমা খুলে, সাইকেল ঠেলে একটি ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা অনুগমন করত। এসব স্মৃতিই থেকে যাক।

বলতে বাধা নেই, আজ যখন কলেজটির কথা পঞ্চাশ বছর পরে, দূর থেকে ভাবি, তখন মনে হয়, ডি. এন. কলেজের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে রইল। এ সত্য স্থায়ী হয়ে থাকবে যে আমি ছিলাম, প্রথম শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম আর বাংলা বিভাগের প্রথম শিক্ষক।

কৃতজ্ঞতার অনেক বিষয়ই তো রয়েছে। শেষ করি, আর একটি প্রসঙ্গে। কলেজ বাড়িটি যখন তৈরি হচ্ছে, তখন আমাদের অনেকেরই উৎসাহের বিষয় ছিল, তার প্রতিদিনের সংযোজন। কলেজে ক্লাস করা ছাড়া বিশেষ কোনো কাজ ছিল না, তাই ঘুরে ফিরে বাড়িটিতেই যাওয়া। আমার এ বিষয়ে একটু বাড়াবাড়ি ছিল বোধ হয়, সহকর্মীরা টিপ্পনীও কাটতেন একটু। বাড়ি কিছুটা বেড়ে উঠলে, স্থানীয় অনেকেই দেখতে আসতেন। এদের মধ্যে ছোটরা আঁকিবুঁকি দাগ কাটলে, তাদের সঙ্গে একটু লেগেও যেত। আজ ভাবি, সত্যিই, কি ছেলেমানুষি করেছি! আবার ভাবি, পরে কত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তো যুক্ত হয়েছি, এরকম তো হয়নি। মনে হয় আমার সে বয়স, আর তার সঙ্গে একটি শিশু প্রতিষ্ঠান মিলে যে ভাব হয়েছিল, তা তখনকার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল।

যখন ছাদ হয়ে গেল, বিকেলে অনেকটা সময় সেখানে হাঁটতাম। আমি নিশ্চিত, কলেজ বাড়ির চারপাশে আজ আর সেই নির্বোধ দৃষ্টি যাবে না। কিন্তু অর্ধ শতাব্দী পূর্বের সেই বিকেলগুলি, নির্মল উদার আকাশ মেলে ধরত। পশ্চিমে সূর্য অস্ত গেলে, দূর দিগন্তে ফুটে উঠত বারহারোয়া পাহাড়ের রেখাচিত্র। সেই আশ্চর্য অনুপম দৃশ্য আজ এখানে বসে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারকের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাই।

[ লেখক এই কলেজের সূচনালগ্নে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ]

---

'যারা আমাকে সাহায্য করতে না করে দিয়েছিল আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ,
কারণ তাদের 'না'এর জন্যই আজ আমি নিজের কাজ নিজে করতে শিখেছি।'

—আইনস্টাইন

# ডি. এন. কলেজের ষোলো বছর

## (নয়নভরা জল, আঁচল ভরা ফুল)

**অধ্যাপক ড. মুজিবর রহমান**

১৯৭১ সালের ২রা জানুয়ারি। সকাল দশটা। দুরুদুরু বক্ষে কলেজ চত্বরে প্রবেশ করলাম। সেখানে তখন এক বিষাদ-ঘন পরিবেশ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় গোপাল চন্দ্র সেন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে খুন হয়েছেন। সে এক দুঃসময় চলেছে রাজ্য জুড়ে। কলেজে তখন চলছে স্মরণ সভা। উপস্থিত রয়েছেন অধ্যক্ষ রামগোপাল ভট্টাচার্য এবং ইংরেজির অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়। তাঁরা দুজনেই আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। আজ দুজনেই প্রয়াত। সদ্য ছাত্র-রাজনীতির খোলস ছেড়ে আসা সেখানে স্মরণ সভায় বক্তৃতার মধ্য দিয়ে শিক্ষকতার জীবন শুরু হল।

ধীরে ধীরে কলেজের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া, পরিকাঠামো এবং সহকর্মীদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠলাম। তখন কলেজে কলা বিভাগে বাংলা, ইংরাজি, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি এবং বাণিজ্য শাখায় পাশ স্তর অবধি পঠন-পাঠন চলত। স্থান সংকুলানের অপ্রতুলতার কারণে বাণিজ্য শাখা চলত নৈশ কালে। পরে অবশ্য বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সমস্যা এড়ানোর জন্য তা প্রাতঃকালে স্থানান্তরিত হয়। দিবা বিভাগে ডিগ্রি ক্লাসের পাশাপাশি তখন প্রি-ইউনিভার্সিটি কোর্সের পড়াশুনা চালু ছিল। যাদের সহকর্মী-বন্ধু-অগ্রজ-প্রতিম অভিভাবক হিসেবে পেলাম তাঁদের কথা আজও মনে পড়ে। বাংলা বিভাগে ছিলেন নুরুল ইসলাম মোল্লা এবং কালীপদ ভট্টাচার্য, ইংরাজিতে বিশ্বনাথ রায় আর সন্তোষ মুহুরি। ইতিহাসে ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস এবং অজিত চৌধুরী। আমার বিষয় রাষ্ট্র বিজ্ঞানে পেলাম শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য—আদি-অকৃত্রিম শ্যামদা। দর্শনে ছিলেন আমার এলাকার অগ্রজ-প্রতিম শান্তিদা (শান্তি রঞ্জন পান্ডে) এবং সুখময় বাগ। অর্থনীতিতে ছিলেন আমাদের একই ব্যাচের অলক মিত্র এবং আমার সঙ্গেই যোগদান করলেন আমাদের পরের ব্যাচের, একই কলেজের পরের ব্যাচের সতীর্থ জয়ন্ত আচার্য। বাণিজ্য বিভাগে পেলাম আমার অভিভাবক তুল্য জগবন্ধু মন্ডল এবং সন্তোষ ভট্টাচার্য। জগবন্ধু বাবু (আমাদের সকলেরই প্রায় জগদা) দিবা বিভাগে পি ইউ ক্লাসে বাণিজ্যিক ভুগোল পড়াতেন। আর বাংলা, ইংরাজি, অর্থনীতির অধ্যাপকরা বাণিজ্য শাখায় আংশিক সময়ে পড়াতেন। ধীরেনদা পড়াতেন বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন। আর ছিলেন ছাবঘাটি স্কুলের শিক্ষক শ্রীপতি মোহন দাস। বাণিজ্য বিভাগে অঙ্ক পড়াতেন। নুরুল ইসলাম মোল্লা এবং বিশ্বনাথ রায়ের যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত অরঙ্গাবাদ বার্তা পত্রিকা এলাকার সংবাদ ও সংস্কৃতি চর্চার বাহন হিসেবে কিছুদিন আগ্রহের সঞ্চার করেছিল।

আজকের দিনে শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হবে— আমি প্রথম মাইনে পেতাম ৩৬০ টাকা এবং ছ মাস পর পর ৬০ টাকা করে ইউ জি সি অ্যাড হক। আংশিক সময়ের শিক্ষকরা পেতেন ৬০ টাকা করে, পরে তা বেড়ে ৭৫ টাকা হয়। আমার ভালো মনে আছে এই ৭৫ টাকাকে ১০০ টাকা করার জন্য শিক্ষক সংসদকে অনেক তদ্বির করতে হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তখন যেন একটা সন্তুষ্টির বাতাবরণ ছিল। সেই সময় এদিকে জঙ্গীপুর কলেজ ওদিকে মালদা কলেজ মাঝে বিস্তীর্ণ ভূভাগে এটি একমাত্র কলেজ। ছাত্রের চাপ ছিল বেশ। উত্তরবঙ্গের দিক থেকে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে পড়বার আগ্রহে মালদা, দিনাজপুর এমনকি জলাপাইগুড়ি, কুচবিহার থেকে ছাত্ররা এই কলেজে পড়তে আসত। বিশেষত এই কলেজের বাণিজ্য বিভাগের তখন বেশ

নাম-ডাক ছিল।

এই সময়ে কলেজের পড়াশুনায় একবার ছেদ পড়ে। ফারাক্কা ব্যারেজের ব্যাকওয়াটার এবং ভাগীরথীর ব্যাপক বন্যায় সমগ্র এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। এলাকার বন্যা-দুর্গত মানুষকে কলেজ ভবনে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। স্বভাবত প্রায় দু মাস কলেজের পড়াশোনা লাটে ওঠে। তার কিছুদিন পরে আবার সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনে বাস্তুচ্যুত শরণার্থীরা এ পারে আসায় তাদের আশ্রয়ের ঠিকানা হয়ে ওঠে কলেজ ভবন। এই সময়কালে কলেজের দিনগত কালাতিপাত ছাড়া কোনো উন্নয়ন চোখে পড়েনি। তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহাশয়ের সে ব্যাপারে তেমন কোনো উদ্যোগ ছিল বলে মনে হয়নি। এক দুঃখজনক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে অধ্যক্ষ রামগোপাল ভট্টাচার্য মশাই -এর এই কলেজে পরিসমাপ্তি ঘটে।

এলেন শ্রীকুমার আচার্য কলকাতার বি কে সি কলেজ থেকে অধ্যক্ষের দায়ভার নিয়ে। তিনি অবশ্য ইতিপূর্বে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজের শিক্ষক হিসেবে কাজ করার সুবাদে এ জেলার সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। শ্রীকুমার বাবুর আগমনের মধ্য দিয়ে কলেজের এক নতুন যাত্রাপথ সুচিত হল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে নানাভাবে পরিচিতির সুবাদে তাঁর উদ্যোগে প্রথম বছরেই কলেজে বিদ্যায়তনিক উন্নয়ন ঘটল। কলা বিভাগে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং বাণিজ্য বিভাগে হিসাব শাস্ত্রে অনার্স পাঠক্রম চালু হল। বাণিজ্য বিভাগে অনার্স চালু হলে বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন পড়ানোর আংশিক কাজ জোটে আমার বরাতে। অনেক সিনিয়র সহকর্মীর এতে আমার প্রতি এক স্নেহ মিশ্রিত অসুয়া প্রকাশ পায়।

কলেজ-সীমা প্রাচীর নির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের ধারারও সুচনা হল শ্রীকুমার বাবুর হাত দিয়ে। তিনি আমাদের অভিভাবক হিসেবে এক যৌথ পরিবারের প্রধান হয়ে উঠলেন। তাঁর সহধর্মিনী জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যাপিকা অজিতা আচার্য মাঝে মাঝে যখন আসতেন তখন আমাদের এই যৌথ পরিবার ষোলোকলায় পূর্ণ হয়ে উঠত। আমরা সকলেই প্রায় পরিবার নিয়ে অরঙ্গাবাদে বসবাস করতাম। একেক দিন একেক বাড়িতে চা-চক্র গুলজার হয়ে উঠত। কলেজ-কেন্দ্রিক জীবনে কলেজ ছিল আমাদের ধ্যান-জ্ঞান। কিছুদিন আগে এ জেলার এক নতুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতিকে কলেজের হাল-হকিকত নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন ঃ 'বাস টু ক্লাস', 'ক্লাস টু বাস' 'কালচারের মধ্য দিয়ে কলেজ চলছে। তাঁর এই সিরিও-কমিকাল উক্তি আজ অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। তখন আমাদের এই ডি এন কলেজে এই বিষয়টি গড়ে ওঠেনি। অনেক সময় ক্লাস না থাকলেও আমরা কলেজে গিয়ে হাজির হতাম।

তাই এই কলেজের পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্তের দাবিদার হয়ে ওঠে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কলেজে এক সুস্থির বাতাবরণ সৃষ্টি করে। আমরা শিক্ষকরা একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে একাত্মতার বন্ধনে আবদ্ধ হই, তেমনই স্থানীয় জন-জীবনের সাথেও সম্পৃক্ত হয়ে উঠি। মনে পড়ে প্রয়াত ব্রজ সরকার মশাই-এর কথা। আমাদের ব্যক্তিগত-পারিবারিক সুবিধা অসুবিধার প্রতি এই মানুষটির সতর্ক দৃষ্টি থাকত। আমাদের যে কোনো প্রয়োজনে তিনি খবর পেলেই হাজির হয়ে যেতেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও রাজনীতির বাইরে আমাদের শিক্ষক পরিবারের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম নিজামুদ্দিন আহমেদ এবং ইয়াদ আলী সাহেবকে। আর ছিলেন দহর পাড়স্থ আলেয়া সংসদ পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান শ্যামবাবু। আমাদের অবসর বিনোদন ও সংস্কৃতি চর্চার এক ক্ষেত্র ছিল এই আলেয়া সংসদ। বাড়তি ছিল শ্যামবাবুর মশলা মুড়ি ও তেলে ভাজার আকর্ষণ। আর ছিল জ্ঞানবাবুর বান্ধব লাইব্রেরি। সেটাও ছিল আমাদের এক মিলনক্ষেত্র। এই সময় কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক তপেন বাবুর এক ব্যক্তিগত বিষয়কে কেন্দ্র করে আমরা কলেজের প্রায় সকলেই এক অনভিপ্রেত ঘটনায় জড়িয়ে পড়ি। তপেন বাবুর বাড়িতে ডোমেস্টিক হেল্প হিসেবে কাজ করত স্থানীয় একটি ছেলে। তার সাথে কিছু দুর্ব্যবহারের অভিযোগে পুলিশে ডায়েরি হয়। তার পরিণতিতে তপেন বাবুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করে। এতে ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। এলাকার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মহলেও বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। সমগ্র সুতি থানা এলাকা জুড়ে পুলিশ-প্রশাসন বিরোধী বিক্ষোভ এক ব্যাপক আন্দোলনের রূপ নেয়। ক্রমশঃ তা মানবাধিকার আন্দোলনে পরিণত হয়। স্থানীয় বি ডি ও, জঙ্গিপুরের এস ডি ও মীরা পান্ডে (পরে যিনি পঃবঃ রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেছিলেন) এই বিক্ষোভের প্রতিহত করতে প্রশাসনের তরফে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। একঅর্থে একদিকে শাসক-দল পুলিশ-প্রশাসন আর অন্যদিকে শিক্ষার সাথে জড়িত ব্যাপক জনগণ। এই আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল নিমতিতা জমিদার বাড়ির বর্ষীয়ান মানুষ রাধানাথ চৌধুরী, শ্যামল টকিজের মালিক সরল গুহ, স্থানীয় শিক্ষক কমলা কান্ত ঘোষাল, পূর্বোক্ত নিজাম সাহেব এবং ইয়াদ আলি সাহেব। সেইসঙ্গে এই অধমকেও কিছুটা ভূমিকা পালন করতে গিয়ে প্রশাসনিক মহলের বিরাগ ভাজন হতে হয়েছিল। ফৌজদারি মামলাও আনীত হয়েছিল আমার বিরুদ্ধে। তবে এই গোধুলি বেলায় মনে হয় আমরা অ-পাত্রে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলাম।

কারণ যার জন্য এই আন্দোলন সেই তপেন বাবুকে দিয়ে এলাকার মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি বিবৃতি দেওয়ানো যায়নি।

এই একান্নবর্তী পরিবারের প্রসঙ্গে আর একজনের কথা বেদনার সাথে স্মরণ করতে হয়। তিনি বাণিজ্য বিভাগের প্রধান জগবন্ধু মন্ডল। সান্ধ্য কলেজে তাঁর সান্নিধ্য লাভের আশায় আমরা কলেজে প্রায়শঃ হাজির হতাম। অবসরের বিকেলে গঙ্গার চরায় তিনি। স্পোর্টসের মাঠে তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় নজরদারি বা অন্য কোনো উপলক্ষে বাড়তি প্রাপ্তিযোগ ঘটলে তা দিয়ে কলেজ চত্বরে নৈশ ভোজের আয়োজনে তিনি। অধ্যক্ষ থেকে চুন্নু জমাদার একসাথে পংক্তি ভোজনের আয়োজন। সেখানেও আমাদের জগদা। তাঁর অকালে চলে যাওয়া আমাদের কাছে আত্মীয় বিয়োগের মতো।

এবারে আসি আমার নিজের বিষয়ের কথায়। অনার্স খোলার কিছুদিনের মধ্যে আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্যামদা কলেজ ছেড়ে শ্রীপৎ সিং কলেজে চলে গেলেন। বিভাগীয় পঠন-পাঠন ও সাংগঠনিক দায় পড়ল আমার উপর। বিভাগে নতুন যোগদান করলেন শেখরেন্দ্র চন্দ্র সেন। আমরা সকলে এই মানুষটির প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্বের জন্য তাকে অন্য নজরে দেখতাম। সে বড়োদের শেখর আর ছোটোদের শেখরদা হয়ে যায়। কারুর কাছে ই শেখরবাবু হয়নি। আমাদের শিক্ষকদের শুধু নয়, ছাত্র-ছাত্রী স্থানীয় মানুষ জন দোকানদার-ব্যবসায়ী সকলের কাছে শেখরের ছিল এক স্বভাবগ্রহণ যোগ্যতা। সে বেড়াতে খুব ভালোবাসত। আমরা বলতাম ওর পায়ের তলায় সর্ষে। তার কিছুদিন পরে এল আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-পাঠী বন্ধু তরুণ সেনগুপ্ত। খেলা এবং সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ। সবশেষে চতুর্থ সুজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। মাঝে কিছুদিনের জন্য এসেছিলেন প্রবোধ সাহা। তিনি করিমপুর পান্নাদেবী কলেজে যান। শেখরের উদ্যোগে রোববার বা ছুটির দিনে বারহাড়োয়া পাহাড়ে বিন্দুবাসিনী মন্দির বা বল্লালপুরে ফিডার ক্যানেলের ধারে শীতের দুপুরে পিকনিকের মেজাজ, কখনো গণকর-মির্জাপুরে সিল্ক ফ্যাক্টরি দেখতে যাওয়া। এসব ছিল আমাদের কর্ম-মুখর জীবনের বাইরের জগৎ। এছাড়া শেখরের টানে দৈনন্দিন নিমতিতা স্টেশন বা সাঁজুর মোড়ে বিকেল-সন্ধ্যা কাটানো। সঙ্গী বাংলা বিভাগের অগ্রজ-প্রতিম ডঃ সুনীল সেনগুপ্ত আর বাণিজ্য বিভাগের বিদ্যাপতি হালদার। ডায়মন্ড হারবারের মানুষ। নিজেকে 'দোখনো' বলে পরিচিতি দিতে ভালোবাসত।

এইসব মিলিয়ে জীবনের রোদ্রোজ্জ্বল দিনগুলো কেটেছে এই কলেজকেন্দ্রিক পারিবারিক পরিমন্ডলে। আমার বাসাবাড়ি কলেজের সব থেকে কাছে হওয়ায় ওইখানে অনেকের পায়ের ধুলো পড়ত প্রায়শঃ। আমার মেয়ে তখন ছোটো, সকলকে আপন করে নিত। মনে পড়ে অধ্যক্ষ শ্রীকুমার বাবু অসুস্থ মানুষ কলেজ যাওয়ার পথে আমার বাড়ির সামনে আম গাছের নীচে বিশ্রাম নিতেন আর আমার মেয়ে টুম্পা ডাকত 'পিন্সিল' চলে এস আমাদের বাড়িতে। স্যার তখন বলতেন, 'এখন না-রে, সন্ধ্যাবেলায় আসব। পরে পিকু হয়েছে। ওরা শেখরকে 'কাকা' বলে ডাকত, তরুণকে 'তুন' আর সুজিত নতুন এসেছিল বলে চিরকাল 'নতুন কাকা' রয়ে যায়। সুনীলদাকে কেন জানি না ওরা নাম ধরে ডাকত। সুনীলদা এতে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দিয়ে মজা পেত।

এমনি করে পরবাসের জীবন কেটেছে অরঙ্গাবাদে। সে এক আনন্দের দিন। দেখতে দেখতে দেড় দশকের অধিককাল কাটিয়ে দিলাম। যে অধ্যক্ষের কাজকে আমরা সহকর্মী মহলে পছন্দ করতাম না। জনান্তিকে বলি বন্ধু মহলে সব থেকে কঠিন অভিসম্পাত ছিল 'তুই প্রিন্সিপ্যাল হয়ে জন্ম নিস।' সেই অধ্যক্ষগিরির কাজ নিয়ে ডি এন কলেজ ছাড়লাম। ৭ জুলাই, ১৯৮৬। এই কাজ নিয়ে যাওয়ার পেছনে যাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল তিনি আজ নেই। প্রয়াত নির্মল মুখোপাধ্যায়, জেলাপরিষদের সভাধিপতি এবং ইসলামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি, তাঁর কেন জানি মনে হয়েছিল তাঁর কলেজের বেহাল দশার হাল ধরতে হবে আমাকে। এক্ষেত্রে পরোক্ষ ভূমিকা ছিল জেলা পরিষদের তদানীন্তন সহ-সভাপতি নিজামুদ্দিন সাহেব। তাঁর ক্রমাগত প্ররোচনাতেই একমাত্র এই অভিশপ্ত চাকুরি জীবনে প্রবেশ করেছিলাম। 'প্রফেসর রহমান লেখাপড়ার করি অবসান, প্রিন্সিপ্যালের চেয়ারে বসিলেন অতি কেয়ারে।' জীবনের এই পর্যায়ে পেয়েছি অনেক হারিয়েছিও অনেক। দীর্ঘ কর্ম জীবনে ছাত্রদের নিয়ে যে পারিবারিক বৃত্ত, তা এই কলেজকেন্দ্রিক। সময়ের দিক দিয়ে অধিক হলেও অন্যত্র ছাত্র-বৃত্ত পাইনি। অরঙ্গাবাদের গ্রামে গ্রামান্তরে এখনও অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছড়িয়ে আছে, যারা পুত্র-কন্যা এমনকি নাতি নাতনিদের সাথে আমাকে পরিচিত করাতে আসেন। মনে পড়ে আমিরুল, আজিজুর, রেজাউলদের সাথে পারিবারিক সম্পর্কের কথা। মালদা-দিনাজপুরের ভুপেন, ভৈরব, গঙ্গাধরের কথা ভুলি কেমনে। ভুতনির চরে বেড়াতে যাওয়ার এমরানের আমন্ত্রণ ভুলতে কি পারি। জিন্নতুন, মমতাজ, ঝর্ণা, রুবেদার মতো ছাত্রীদের কথাই বা ভুলব কেমন করে। এ সবই আমার ডি এন কলেজের জীবনের পরম পাওয়া।

এ আমার আঁচল ভরা ফুল। সেই সাথে নয়ন ভরা জলও কম নয়। অনেক একান্ত প্রিয়জন যাদের পেয়েছিলাম এখানে, তাদের অনেকেই আজ আর নেই। বেদনার মতো এই বিয়োগ ব্যথা এখনো বাজে হৃদয়ে। যাদের হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছি তাদের মধ্যে প্রথমেই

যে নামটি মনে আসে জগবন্ধু মন্ডল। আর মনে আসে শ্রীকুমার বাবুর কথা। কলকাতা থেকে ফিরে এক সকালে প্রাক্তন ছাত্র শশাঙ্ক সেই মর্মান্তিক খবর দিল। সেই দিনটির কথা এখনো চোখের সামনে ভাসে। একটি ব্যাপারে আমরা শ্রীকুমার বাবুর নিকট ঋণী। পূর্বোক্ত তপেন বাবুর বিষয় নিয়ে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ব্লক প্রশাসন তখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের সকলকে দুর্গম, জটিল স্থানে নির্বাচনী দায়িত্ব দিয়ে জব্দ করতে চেয়েছিলেন। মাননীয় শ্রীকুমার বাবুর কৌশলগত কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের এই হয়রানির হাত থেকে রেহাই মেলে।

শ্রীকুমার বাবুর চলে যাওয়ার পরে কিছুদিন ধীরেনদা কলেজের দায়-ভার সামলেছেন। তারপর এলেন অনিল চন্দ্র গুহ। পদার্থ বিদ্যা ছিল তাঁর বিষয়। কিন্তু তিনি স্ব-উদ্যোগে বাণিজ্য বিভাগে অঙ্কের ক্লাস নিতেন। সব ব্যাপারে ছিল তাঁর উদ্যোগ। তিনি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খুলে একে পরিপূর্ণ রূপদান করেন।

এই কলেজের আর যাদের হারিয়েছি, আমার অগ্রজ-প্রতিম শ্যামদা, ধীরেনদা, অনুজ-প্রতিম গোপীশ্বর বিশ্বাস, ইংরেজির প্রাক্তন অধ্যাপিকা বন্ধু ভারতী ব্যানার্জী। সব শেষে যাকে হারালাম অতি সম্প্রতিকালে সে আমার বন্ধু-সহপাঠী তরুণ সেনগুপ্ত।

তরুণের কথা বলতে নিজেদের কথা যেন বেশি করে মনে পড়ে যায়। আমাদেরও কি সময় ফুরিয়ে আসছে। তরুণের সাথে কলেজ ছাড়ার পরে তেমন দেখা সাক্ষাৎ না হলেও দূরভাষে যোগাযোগ ছিল প্রায় নিয়মিত। কিন্তু কিছুদিন ধরে সে যোগাযোগটা কেন জানি একটু ক্ষীণ হয়ে আসছিল। যা হয় আর কি। হঠাৎ কিশোরের ফোন পেলাম, একটু ধরা গলা। কিশোরের ফোনে যে উচ্ছ্বাস থাকে তা নেই। কিছু একটা বলতে গিয়ে বলতে পারছে না, এমনিভাবে সেই মর্মন্তুদ খবরটা দিল। চোখের সামনে থেকে অনেকগুলো বছর যেন সরে যেতে থাকল। মনে হয় এই তো সেদিন ১৯৬৬-৬৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ বিল্ডিং। ২৪ নং ঘর। পাশাপাশি বসে এক বেঞ্চিতে ক্লাস করা। তরুণের অবশ্য মাঠের দিকে মন থাকত বেশি। জেনেছিলাম ও মালদার এক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হয়েছে। তারপর ১৯৭৪ সালের কোন এক বিকেলে এই কলেজের নিয়োগপত্র নিয়ে প্রথম আমার সাথে দেখা করল। আমি শ্রীকুমার বাবুর কাছে নিয়ে গেলাম। পরদিন কাজে যোগদান করল। তারপর থেকে কাজের ক্ষেত্রে সহযোগী সহকর্মীর মতো কাজ। বাকিটা পুরোনো বন্ধুর মতো আচরণ। তরুণের থাকার জায়গা ঠিক হল নিমতিতা স্টেশনের কাছে দফাহাটের কুমার ব্রাদার্স নামক বিল্ডিং-এর হিন্দু হোস্টেলে। এই হোস্টেলের তার ঘর যেন অস্থায়ী ঠিকানা হয়ে উঠল আমাদের। সময়ে-অসময়ে আমরা এখানে চলে আসতাম। তার গানের আকর্ষণে। ওর প্রিয় নজরুল গীতি ছিল নয়ন ভরা জল গো তোমার আঁচল -ভরা ফুল। ওর কথা মনে করেই আমি আমার এই স্মৃতি কথার শিরোনামে এটাই ব্যবহার করলাম।

পরে তরুণ আমাদের বাসার কাছে শেখরদের মেসে চলে এল। তখন সুনীলদা, কিশোর, সুজিত, বিদ্যাপতি, মধ্যমণি শেখর আর আমরা সপরিবারে। সব মিলিয়ে এক নরক গুলজার। সে এক আনন্দ-ঘন দিন। সেকি ভোলা যায়। তারপর ওর পারিবারিক জীবনে পাশেই বাড়ি ভাড়া নিল। তখন আমরা প্রায় এক পরিবারের সদস্য হিসেবে বাস করতাম। এ বাড়ির ভালো পদ রান্নার বাটি ও বাড়িতে চলে যাওয়া হর-মামেশার ব্যাপার ছিল। আমার শিশু কন্যা প্রায়শঃই 'বন্দনা কাকিমার' (তরুণ-গিন্নি) কাছে থাকা-খাওয়া পছন্দ করত। তরুণ-পুত্র বাবিদা ছিল ওর একমাত্র খেলার সাথী। ধুলিয়ানে চাকুরি নিয়ে চলে গেলে বন্দনাদের সাথে কিছুটা ব্যবধান তৈরি হলেও মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়নি কোনোদিন।

তরুণের চলে যাওয়ার খবর পেয়ে আমি দেখা করতে যেতে পারিনি শারীরিক কারণে। ফোনে বন্দনা কোনো কথা বলতে পারল না। শুধু এক নাগাড়ে কেঁদে গেল। তরুণ ছিল একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক, ভালো সংগঠক... সে খেলার মাঠেই হোক কিংবা সংস্কৃতির অঙ্গনে। হোস্টেলে থাকাকালে ছাত্রদের দিয়ে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যা উদযাপন, কলেজ মাঠে ছাত্র-শিক্ষকদের নিয়ে, বা ইন্টার-ক্লাস ফুটবল প্রতিযোগিতার মধ্যে তরুণের এই সাংগঠনিক প্রতিভার পরিচয় মিলেছে। তার এই অকালে চলে যাওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা হারাল তাদের টি কে এস স্যারকে। তার আত্মীয় পরিজন হারাল আপনজনকে। আমি হারালাম এক পুরাতন বন্ধু-সুহৃদ-সহ কর্মীকে। শেষ বেলায় একটি অন্য কথা বলি— আমাদের মধ্যে একটি কথা চালু ছিল। কোথাও যাওয়ার সময় তরুণের সাথে দেখা হলে যান বাহন বিভ্রাট অনিবার্য। সুনীলদাই একথাটি চালু করেছিলেন। আস্তে আস্তে সেটা একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। সুনীলদা কলকাতা যাওয়ার জন্য রাতের ট্রেন ধরতে গেলে পারতপক্ষে তরুণের দর্শন এড়িয়ে যেত। আজ সুনীলদাকে কাছে পেলে জানতে চাইতাম— তরুণ নিজের শেষ ট্রেনটাকে বিলম্বিত করতে পারল না কেন?

[লেখক এই কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক, রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক-শিল্প আইন (১৯৭১-১৯৮৬)]

# স্মৃতি সততই সুখের—
# কলেজ জীবনের স্মৃতি কথার ভগ্নাংশ

ড. অজিত কুমার চৌধুরী

দূর দিগন্তে কালের উত্তরীয়ের সঙ্গে যে জীবন হারিয়ে গেছে সেই স্মৃতি ফিরে ফিরে আসে। সেই কথা আরও স্পষ্ট হলো যখন গত ৭ই জুলাই '১৭ বিকেলে কলেজের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিখিলেন্দু দাস মহাশয়ের কাছ থেকে একটা দূরভাষ বার্তা এল। ডি. এন. কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কলেজ যে স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করবে, তাতে ছাপার জন্য আমাকে কলেজে কর্মজীবনের দু-চার কথা লিখে পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। এমনিতে আমার লেখার অভ্যাস নেই বললেই চলে। তাছাড়া ফেলে আসা জীবনের কোনো দিনলিপিও আমার কাছে নেই। যেটুকু লিখতে হবে সবটাই স্মৃতি হাতড়ে খুঁজে বের করতে হবে। কাজেই কিছু ভুল-ভ্রান্তি হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেরকম কোনো ভুলের জন্য প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

দুঃখুলাল নিবারণচন্দ্র কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় ২৩শে আগস্ট ১৯৬৭ সালে। জন্মলগ্নে আমি ছিলাম না। কারণ আমি ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করি, ১৭ই আগস্ট ১৯৭০। প্রায় ৩ বৎসর পর। তবে প্রতিষ্ঠালগ্নে যেসকল সুযোগ্য ও নিষ্ঠাবান শিক্ষক একটি শিশু প্রতিষ্ঠানকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের সান্নিধ্য ও সক্রিয় সহযোগিতায় আমার কলেজে কর্মজীবনের প্রথম পথচলা অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ শ্রী বিজন কান্তি বিশ্বাস। ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, দর্শনের শ্রী শান্তি রঞ্জন পাণ্ডে, বাণিজ্যের শ্রী জগবন্ধু মণ্ডল ও আরও অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের মধ্যে শ্রী দিবাকর পাল (বড়বাবু), শ্রী রাখহরি মুখার্জী (ক্যাশিয়ার), নজরুল ইসলাম (হিসাব রক্ষক) এবং শ্রী নরেন্দ্রনাথ বারিক ও গ্রন্থাগারিক শ্রী সন্তোষ সরকার মহাশয়কে পেয়েছিলাম। যাঁদের আন্তরিকতা ও অমায়িক ব্যবহার আমাকে কোনোদিন বুঝতে দেয়নি যে আমি পারিবারিক স্নেহ-মমতার গণ্ডীর বাইরে আছি। এঁদের মধ্যে আজ অনেকেই আমাদের কাছ থেকে চির-বিদায় নিয়েছেন। তাঁদের জীবনস্মৃতি আমার মানসপটে চির সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। জীবনের এই পড়ন্ত বেলায় জীবিত ও মৃত সকল সহকর্মীকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রণাম।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে অরঙ্গাবাদের মতো মূলত বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত ও আধুনিক উচ্চ শিক্ষার আলো থেকে নির্বাসিত জেলা সদর থেকে বহু-দূরে, অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও দারিদ্র-পীড়িত একটি ছোট জনপদে (ব্লক টাউন) মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যাঁরা বাস্তবায়িত করেছিলেন বিশেষ করে MBM কোম্পানীর অন্যতম ডিরেক্টর প্রয়াত শ্রী দিলীপ কুমার দাস, বিড়ি শ্রমিক নেতা ও লোকসভার প্রাক্তন সদস্য, শ্রদ্ধেয় হাজী লুৎফল হক সাহেব এর সুমহান অবদান এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এই দুই মহান কর্মযোগীর অবদান অরঙ্গাবাদের সকল সচেতন মানুষ ও কলেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত প্রাক্তন ও বর্তমান সকল কর্মীবৃন্দ চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন।

১৯৭০-এ আমি যখন কলেজে প্রথম যোগদান করি, তখন অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় শ্রী রামগোপাল ভট্টাচার্য মহাশয়। আমার সঙ্গে একই দিনে বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন অগ্রজপ্রতিম শ্রী সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য। তার কিছুদিন পরে আসেন ড. মুজিবর রহমান, শ্রী বিদ্যাপতি হালদার, প্রয়াত গোপীশ্বর বিশ্বাস, অধ্যাপক রামচন্দ্র দাস, শ্রী তরুণ কুমার সেনগুপ্ত, শ্রী শেখরেন্দ্র চন্দ্র সেন, ড. কিশোর কুমার রায়চৌধুরী ও আরও অনেক বন্ধু। সময়ের ব্যবধানে অনেকের সঙ্গে আজ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও মনের মণিকোঠায় তাঁদের প্রাত্যহিক কর্মজীবনের উপস্থিতি

ও অগ্রজ-অনুজ সম্পর্কের বন্ধন ও মধুর স্মৃতি সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। আমার সুদীর্ঘ কর্মজীবনে (১৯৭০-২০০৫) সকল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের কাছ থেকে যে স্নেহ ভালোবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছি তা কখনো ভোলার নয়। আজও বৈশাখের তপ্ত দুপুরে পাড়ার গলিতে যখন ক্লান্ত ফেরিওয়ালা পসরা বিক্রির হাঁক দিয়ে যায়, আমার স্মৃতিকাতর মনের দৃষ্টি তখন আকাশের দূর নীলিমায় ভেসে ভেসে অরঙ্গাবাদ ও তার চারপাশের সংলগ্ন গ্রামগুলোতে হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি খুঁজে বেড়ায়। মনে মনে ভাবি একবার কি সেই দূর অতীতে ফিরে যাওয়া যায় না? অথচ আজকের দিনের আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তুলনায় তখন অনেক কম বেতনে আমাদের দিন চালাতে হয়েছে। তখন আমাদের বেতন হার ছিল ১৪০-৪৪০ টাকা ও তার সঙ্গে সামান্য ভাতা। সব মিলিয়ে আমরা মাসে পেতাম ৩২০ টাকা। যা স্কুলের বেতন থেকেও ২০ টাকা কম ছিল। পরিচিত জনরা ঠাট্টা করে বলত, 'নামের আগে অধ্যাপক লেখার জন্য ২০ টাকা কম বেতন।' এখনো শুনি অধ্যাপকদের বেতন কর্পোরেট দুনিয়ার কর্মীদের থেকেও বেশি। সময়ের পরিবর্তনে বেতন ভাতার পরিবর্তন হতেই পারে। তা সত্ত্বেও বলব, আমরা যারা সাত/কিংবা আটের দশকে কম বেতনে শিক্ষকতার কাজ করেছি, কর্মক্ষেত্রে কোনোরকম বাধা বিঘ্নহীন নিরুত্তাপ পরিবেশে শান্তিতে কর্তব্য সাধন করতে পেরেছি। আজকের মতো এতো অনিশ্চয়তা ছিল না। আজ ভাবি সেদিনের বেতন ভাতার চিত্র ও আজকের বেতন ভাতার চিত্রে আকাশ পাতাল ফারাক। ১৯৭০ থেকে '৭৮-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলেজ কর্মীদের সামান্য মাসিক ৮/১০ টাকার ভাতা ছাড়া কোনো সরকারি অনুদান ছিল না। সম্পূর্ণ বেসরকারি ব্যবস্থায় ছাত্র বেতনের উপর নির্ভর করে এবং ৩২০ টাকার মাসিক বেতনও কয়েক কিস্তিতে পেয়ে আমাদের সংসার চালাতে হতো। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, কিন্তু শান্তি ছিল। কম বেতনের কারণে শিক্ষকদের বিয়ের বাজারে কোনো সামাজিক মর্যাদা ছিল না। এমনকি বিয়ের জন্য পাত্রীও জুটত না। অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয় ১৯৭৮ সালে ফেব্রুয়ারি থেকে সরকার কলেজ শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর।

১৯৭০ থেকে ৮০'র কালপর্বে আমরা কলেজ কর্মীরা যখন আর্থিক সংকট ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে দিশেহারা তখন কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার আচার্য মহাশয় ও কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় শ্রী দিলীপ কুমার দাস মহাশয়ের কাছ থেকে অফুরন্ত সহযোগিতা ও নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েছি। আজ জীবনের এই শেষ বেলায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের সেদিনের মানবিকতাকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। এই প্রসঙ্গে কলেজের ছাত্রবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় শিক্ষাকর্মী জালাল সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি ও নজরুল সাহেব বর্তমানে কলেজের অদূরেই বসবাস করেন। তাঁদের কাছ থেকে কলেজের সেদিনের অনেক অজানা তথ্য জানা যেতে পারে। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় শ্রীকুমার আচার্য মহাশয় ১৯৮২ সালে ক্যানসার রোগে মারা না গেলে ডি. এন. কলেজের উন্নতি থমকে যেত না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর অক্লান্ত চেষ্টাতেই UGC-র আর্থিক অনুদানে কলেজের দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। দুঃখের বিষয় তাঁর স্মৃতিরক্ষায় আমরা উত্তরসুরিরা কলেজে কিছুই করতে পারিনি।

পরবর্তী অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় অনিল গুহ মহাশয়ের আমলে (১৯৮২-৮৮) কলেজে বিজ্ঞান বিভাগ খোলা হয়, যা ওই অঞ্চলের মেধাবী বিজ্ঞান-পিপাসু ছাত্রদের কাছে জ্ঞানের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল। তবে তিনিও ১৯৮৮ সালে অন্যত্র চলে যাওয়ায় কলেজের উন্নয়নের গতি অনেকটাই শ্লথ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, শ্রদ্ধেয় ধীরেনদা ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত একটানা ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক হিসাবে দায়িত্ব সামলালেও বয়স এবং বিরুদ্ধ পরিবেশের কারণে তিনি কলেজের বৈষয়িক উন্নতি তেমনভাবে করে উঠতে পারেননি। সেই উন্নয়নের গতি ফিরে পেতে কলেজকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরবর্তী শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত। যখন পরিচালন সমিতির সভাপতির দায়িত্বে আসেন পতাকা বিড়ির কর্ণধার ও বিশিষ্ট শিল্পপতি মুস্তাক হোসেন সাহেব এবং অধ্যক্ষের দায়িত্বে আসেন অনুজপ্রতিম শ্রী নিখিল দাস, ড. তপন কর্মকার ও ড. শ্যামল মণ্ডল। আজকের ডি. এন. কলেজের যা কিছু উন্নয়ন তা এঁদেরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল। ঈশ্বরের কাছে এঁদের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

এতক্ষণ কলেজের অনেক কথাই বলা হলো, যা হয়তো অতীত ও বর্তমানের অনেকের কাছে জানা। কলেজের অভ্যন্তরীণ কথা বেশি বলতে গেলে তা বাহুল্য দোষে দুষ্ট হয়ে যেতে পারে। এবার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির কথা বলা যেতে পারে। কলেজের অধ্যক্ষদের যদি যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতির সঙ্গে তুলনা করা হয়, তা হলে বলব শ্রীকুমার আচার্য ও অনিল গুহ ছাড়া ১৯৭০ থেকে '৯০-এর দশকে সেরকম উল্লেখযোগ্য সেনাপতি কলেজে কেউ ছিলেন না। ডি. এন. কলেজের দীর্ঘ ৫০ বৎসরে হাতে গোনা ৬/৭ জন ছাড়া স্থায়ি অধ্যক্ষ ছিলেন না। বেশির ভাগ সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। সেই হিসেবে একমাত্র ধীরেনদার অবদানই সবচেয়ে বেশি। মাঝে মধ্যে তাঁর সাহায্যকারি হিসাবে শান্তিদা কিংবা আমাকে আসরে নামতে হতো। তবে আমাদের অবদান যৎসামান্য। তবুও বলব ধীরেনদা ছিলেন বড়দাদার মতো। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। কিন্তু কাজের সময় ফাঁকি পছন্দ করতেন না। একবার কলকাতা গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে কলেজের কাজ নিয়ে সকাল ১০টা থেকে ১টা পর্যন্ত ধর্মতলা চষে বেড়াতে গিয়ে যথেষ্ট ক্ষিদে পেয়ে গেল। ধীরেনদাকে খাওয়ার কথা বলায়

উনি বললেন, 'শুধু খাই খাই করলে কাজ করবে কখন? কাউন্সিল হাউস স্ট্রিটের কাজ শেষ করে খাবার পাবে।' তাও ওনার সঙ্গে যে খাবার আছে (রুটি/তরকারি) তার থেকে ভাগ দেবেন। হোটেলে খাওয়া চলবে না। গরিব কলেজের অর্থের অপচয় হোক, এটা ধীরেনদা কখনো চাইতেন না। তাঁর কথাই মেনে নিলাম এবং তাঁর নিষ্ঠা ও সততার প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেল। কলেজের পরীক্ষা চলাকালীন নজরদারদের জন্য বরাদ্দ ছিল মুড়ি/চানাচুর অথবা রুটি/তরকারি। ভালো খাবারের কথা বললে ধীরেনদা'র উত্তর 'কত বড়লোকের ছেলে তোমরা? শিক্ষকের চাকরি করতে এসে রুটি/মুড়িতে তোমাদের মন ওঠে না?' এই ছিল আমাদের ধীরেনদার চরিত্র। গল্পপ্রিয় সরল, স্নেহশীল এই মানুষটির জীবন আজকের দিনেও শ্রদ্ধার দাবী রাখে। এছাড়া শান্তিদা, জগবন্ধুদা, সন্তোষদা এঁরা প্রত্যেকেই বড়োদাদার স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা দিয়ে আমার মতো কনিষ্ঠ ভাইদের সব সময় আগলে রাখতেন। এঁদের প্রত্যেকের কথা আমার অবসর জীবনে এগিয়ে চলার প্রেরণা। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তাছাড়া মাঝে মধ্যে কলেজের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কলেজের বাইরের বহু সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি বা এমন কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি যা উল্লেখের দাবি রাখে। কলেজ বহির্ভূত বিশিষ্ট জনেরা যে নানাভাবে কলেজকে সমৃদ্ধ করেছে, বিশেষ করে কলেজের বাৎসরিক খেলাধূলায় কিংবা কোনো অনুষ্ঠানে তা আমার ব্যক্তি জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। এরকম দুজন মানুষ আবুল হোসেন সাহেব ও সামাদ সাহেব এবং জগতাই গ্রামের একজন (নাম ভুলে গেছি, ক্ষমা করবেন)—এঁদের চারিত্রিক গুণাবলী আমাকে মুগ্ধ করতো, ভাবতাম কত উদার চরিত্র হলে, নিঃস্বার্থভাবে একটা প্রতিষ্ঠানকে ভালোবাসা যায়। বর্তমান সময়ে এরকম মানুষ একান্তই দুর্লভ। আরও একটা ব্যাপার আমাকে বিস্মিত করেছে। সেটা হলো অরঙ্গাবাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অসাম্প্রদায়িক মনোভাব। আমার কর্মজীবনের ৩৫ বৎসরে অরঙ্গাবাদের মতো মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে উজ্জ্বল নজির প্রত্যক্ষ করেছি (এমনকি ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের সময়ও) তা আমার সামাজিক অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং এটাও শিখিয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি না থাকলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কোনোদিন ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে অংশ নেয় না। সব ধর্মের মানুষই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন (কিছু ব্যতিক্রমও আছে)। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীকুমার আচার্য মহাশয়কেও দেখা গেছে ধর্মীয় গোঁড়ামির গন্ডী অতিক্রম করে নিজ গৃহে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় দিয়ে তাঁর সেবাযত্ন করতে। আজ কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। তাই এইসব পুরনো স্মৃতি/অভিজ্ঞতা মনের কিনারায় ভিড় করে আসছে। প্রার্থনা করি এইসব মহান চরিত্রের মানুষের কার্যকলাপ যেন ভাবীকালকে পথ দেখাতে পারে, ভবিষ্যত প্রজন্মের অন্তরকে আলোকিত করে।

আমার স্মৃতিচারণা প্রায় শেষ পর্যায়ে। সুদীর্ঘ কর্মজীবনে (৩৪ বৎসর ১০ মাস) অরঙ্গাবাদ ডি. এন. কলেজের সহকর্মী ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পেয়েছি অফুরন্ত ভালোবাসা। যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে ওখানকার সমাজ আমাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল, আমি হয়তো তার যোগ্য প্রতিদান দিতে পারিনি। অর্থের বিনিময়ে যা দিয়েছি, 'সে তোমারি দান—গ্রহণ করেছ যত, তত ঋণী করেছ আমায়।' যে স্নেহ-মমতার জালে আমার অরঙ্গাবাদের জীবন আবদ্ধ ছিল, তাহাই আজ বাকী জীবনের সম্বল। সেই ধাবমান কাল যে আমাকে আমার দ্বিতীয় জন্মভূমির ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় থেকে তুলে নিয়ে এল, যেখানে সকাল সন্ধ্যায় দেবালয়ের কাঁসর ঘন্টার সঙ্গে দূরবর্তী মসজিদের সুউচ্চ মিনার থেকে আজানের সুমধুর মিষ্টি সুর ভেসে আসত সে সকলই আজ অতীত। মাত্র ১৯ বছর বয়সে যে ব্যক্তি স্বদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) জন্মভিটা পরিত্যাগ করে নতুন দেশে পাড়ি দিয়েছিল, সেই ব্যক্তি ৩৫ বছরের জীবনের সোনালী দিনগুলো যে জায়গা আশ্রয় করে, যে মানুষগুলোর স্নেহ ভালোবাসাকে অবলম্বন করে কাটিয়ে দিয়েছে সেই জায়গা তার কাছে দ্বিতীয় জন্মভূমির সমতুল্য। অবশ্যই পবিত্র, সেই চেনা-অচেনা অসংখ্য মানুষ আজও আমার কাছে মহান। প্রসঙ্গত: উল্লেখ করি একজনের কথা—কলেজ/হোস্টেল কর্মী ভ্রাতৃপ্রতিম বাবর শেখ। আমার অরঙ্গাবাদের জীবনকে সহজ করে তুলতে যার অসামান্য অবদান ছিল সেই বাবর শেখকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। তার জীবন সুখ-শান্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনাই করি। এছাড়া বান্ধব লাইব্রেরি ও তার মালিক জ্ঞানদা (দিবাকর বাবুর দাদা), অরঙ্গাবাদ বুক ডিপো আলেয়া সংসদ (শ্যাম খুড়ো), নিমতিতা গঙ্গার চর, দহর পাড় ও সন্তোষদার বাড়ি—এগুলো ছিল আমার নিত্য বিচরণভূমি। আজ স্মৃতিভারে অতীত নিঝুম হয়ে গেছে। তবুও সেই স্মৃতির সরণি বেয়ে পথ চলায় বাঁচার আনন্দ পাই।

অরঙ্গাবাদ কলেজের বর্তমান ও অতীত (বিশেষ করে অনুজপ্রতিম সাধন, সুনীল ও সাবলুল হক) শিক্ষক কর্মী ও ধ্রুব, হরোজ, স্বাধীন সহ সকল শিক্ষাকর্মীবৃন্দকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে থাকল অনির্বাণ দীপশিখা ও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। অরঙ্গাবাদের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ (বিশেষ করে পতাকা বিড়ি, দাস কোম্পানী, শিব বিড়ি, হাওড়া বিড়ি'র কর্ণধারসহ) ও অসংখ্য নাম না জানা মানুষকে আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও প্রণাম জানিয়ে আমার স্মৃতিচারণা শেষ করলাম।

**[লেখক এই কলেজের ইতিহাস বিষয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ]**

■

# দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ : আমার নানা রঙের দিনগুলি

অধ্যাপক ড. লায়েক আলি খান

আমার ২৮ থেকে ৩৬ বছরে কর্মজীবন কেটেছে এই কলেজে। এলোমেলো দিন-রাত্রির অজস্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এখান থেকে। 'অভিজ্ঞতা' কথাটি ঠিক ঠিক মনে এলো। বস্তুত আমার প্রথম দিকের চাকরি জীবনে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে অনেক ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ আমি ক্রমশ অভিজ্ঞ হয়েছি এখানে। আজ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় সেসব কথা কেমন এক অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। রোম্যান্টিক কীট্‌স-এর বলা সেই 'নাম্বনেস পেইন'-এর মতো এক অসাড় বেদনা।

মনে পড়ে এই কলেজে যোগদানের প্রথম দিনটির কথা। নিয়োগপত্র পেয়ে কলেজ সার্ভিস কমিশনে কলেজটির অবস্থান সম্বন্ধে খবর নিতে গেছি। কেননা পশ্চিমবঙ্গে কোনো ঔরঙ্গাবাদ আছে, জানা ছিল না। জানলাম মুর্শিদাবাদ-এর নিমতিতা স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল ঔরঙ্গাবাদ। মুর্শিদাবাদ মানে তখনো আমার কাছে সিরাজের ইতিহাস। ক্লাস এইটে পড়ার সময় সিরাজ চরিত্র-র অভিনয়ের জন্য হেড-মাস্টারমশাই নির্বাচন করেছিলেন আমাকে। সেই অভিনয়ের সময় থেকে মুর্শিদাবাদ আমার কাছে একটা স্বপ্নের এলডোরাডো। তার পথে ঘাটে নবাবী আমলের ঐশ্বর্য। আরো নানা বিলাস ও ব্যসনের চলচ্চিত্র আমার স্মৃতি জুড়ে। কখনো মুর্শিদাবাদ বেড়াতেও বেরোইনি। ফলে স্বকপোলকল্পিত সিরাজের দেশে চাকরি নিয়ে আসতে আপত্তি ছিল না। ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী বেথুনের প্রিন্সিপ্যাল, আমাদের কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক— 'কল্পনা' পড়াতেন। কবিতার মুগ্ধ ছাত্র হিসেবে তাঁর স্নেহভাজন ছিলাম। খবরটা শুনে তিনি বলেছিলেন অত দূরে যেও না। হাজী দেশারথ কলেজে খালি আছে, তুমি তো ক্যানিং-এ থাকো, ওটা সামনে হবে। দূরে চলে গেলে তোমার গবেষণা, পড়াশুনো বন্ধ হয়ে যাবে। কমিশনে যাও। কমিশনে শুনলাম ওখানে নদী পেরিয়ে যেতে হবে। মাতলা। বর্ষাকালে দুর্ঘটনা ঘটে। কেন যাবেন? এটা ভালো জায়গা। এখানে যান। অগত্যা। তাছাড়া মুর্শিদাবাদ দেখার প্রচ্ছন্ন 'বাসনা' তো ছিল 'ছোট সিরাজ'-এর।

সাজুর মোড়, নিমতিতায় নেমে টাঙা নিলাম। সঙ্গী পুলিশে চাকরি করা আমার ভাইয়ের সহকর্মী। বহরমপুর পর্যন্ত রাতে ট্রেনে এসে সকালে সেখান থেকে বাস ধরে এসেছি। টাঙাওয়ালাকে বললাম ঔরঙ্গাবাদ কলেজ যাবো। ডেকে তুলে নিল। প্রথম টাঙা চড়ার কৌতূহল ও উচ্ছ্বাস আমি প্রকাশ করতে দ্বিধা করিনি। হর্ণ হয়, হাতের ছড়িটা ঘোড়ায় টানা চাকার কাঠের স্পোকের মতো জায়গায় আলতো ধরে রাখলে অদ্ভুত একটা শব্দ হয়। এটা আগে আমি শুনিনি। একদিন ভোররাতে রাস্তায় এই শব্দ শুনে প্রিন্সিপ্যাল-এর বাসায় থাকাকালে চমকেও উঠেছিলাম। সেটা পরের ঘটনা। টাঙাওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম ওখানে হোটেল আছে? খাবার? সে বললে নেতাজি মোড়ে আছে। সেখানে আপনাকে নামিয়ে দেবো। ওখানে খেয়ে কলেজ চলে যাবেন, হেঁটে সামনে।

নেমে হোটেল দেখলাম। বাঁশের চাঁচাড়ি দিয়ে ঘেরা হোটেল। রিক্সা এবং টাঙাওয়ালারা ওখানে খায়। বেরিয়ে পাশের লোকদের শুধালাম এখানে এর থেকে ভালো হোটেল নেই? একটু অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে ও জানালো— আছে, বাজারের ভেতর দিকে। তবে ও ভালো না। আমরা সবাই তো এখানে খাই।

রাস্তার দুপাশে আসার বেলায় টাঙা থেকে দেখছিলাম, আমের

বাগান, গমের ক্ষেত। এখন এই নেতাজী মোড়-এ ভালো করে দেখলাম— ঘোড়ার মল মূত্রে জায়গাটা ভারি। রাস্তার ওপরও পুরু হয়ে জমে আছে টাঙার চাকায় গুঁড়িয়ে যাওয়া ঘোড়ার নাদ। হোটেলের খাবার—পাতলা জলের মতো ডাল। আলু-পটলের মিশ্রণে তৈরি একটি তরল তরকারি, আলুভাজা আর মাছের একটু টুকরো ভাজা তেলমসলা মেশা সরকারি ঝোলে ডোবানো। সরকারি ঝোল এজন্য যে, আপনি ডিমের ঝোল চাইলেও সেই ঝোলে ডিম ভাজাটা ছেড়ে আপনাকে ওরা জলদি সার্ভ করতে পারে।

নেতাজি মোড় থেকে খাওয়া সেরে কলেজে গেলাম। মনে পড়ে, গেটে ঢুকে কলেজের বারান্দায় উঠে বামদিকের গেট খুলে প্রিন্সিপ্যাল-এর ঘরে ঢুকলাম। অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্যকে দেখলাম। শ্রদ্ধেয় সেই সুদর্শন মানুষটি। বয়সের তুলনায় একটু বয়স্ক লাগলো। পরে জেনেছিলাম— শারীরিক নানা অসুখে ভুগছেন। জয়েনিং-এর প্রাথমিক অফিসিয়াল কাজ মিটে গেলে, তাঁর প্রথম প্রশ্ন—

—কোথায় উঠেছো এখানে?

স্পষ্ট জবাব : কোথাও না। টাঙা থেকে নেমে 'হোটেলে' খেয়ে সোজা এখানে।

—যদি অসুবিধে না হয়, তবে আমার কোয়ার্টারে থাকতে পারো। আমি একা থাকি। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না তো?

—না স্যার। কেন? এখানে থাকার কোনো হোটেল নেই।

—আরে ঔরঙ্গাবাদে কিছুই নেই। তোমাকে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হবে। যত দিন তা না হচ্ছে তুমি থাকতে পারো। তারপর ধীরে সুস্থে একটা ঘর দেখে যাবে।

এই কথার পর আমাকে কোলকাতায় ফিরে আমার বেডিং-পত্র আনার জন্য ছেড়ে ছিলেন। ২/১ দিন বাদেই ফিরলাম বইপত্র আর বিছানা নিয়ে সোজা স্যারের কোয়ার্টারে।

ওখানে আমি ছিলাম প্রায় দিন পনেরো। এরপর বাসা ভাড়া না পাওয়ায় চলে গেলাম ছাত্রদের হোস্টেলে। সদ্য নির্মীয়মান একটা ঘরে। মেঝে হয়নি। দেওয়ালে প্লাস্টারও না। কেবল দরজা জানালা বসেছে। নিজে রান্না করে খাই। আর ছাত্রদের কমন টয়লেট ব্যবহার করি। আর স্নান করি বাইরে টিউবওয়েলে, ছাত্রদের সঙ্গে প্রায়। ঘর মিলছে না। কেন না আমার নাম লায়েক আলি খান। সে সমস্যা আমার সারা চাকরি জীবনে ছিল। ক্যানিং-এ, ঔরঙ্গাবাদে, মেদিনীপুরে। এর চেয়ে বরং বলি স্যারের সঙ্গে ১ম দু'সপ্তাহ কাটাবার কথা।

বেশি রাত অবধি পড়ছি। দরজা ভেজানো। হঠাৎ দেখি, ধীরে খুলে যাচ্ছে আমার দরজা। স্যারের মুখ। বললেন : 'এত রাত অবধি পড়ছো? শরীর খারাপ করবে। ঘুমিয়ে পড়ো।' সেদিন বুঝিনি, আসলে স্যার এসেছিলেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কি না দেখতে। প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে এক বছরের মধ্যে বোধহয় মারা গেলেন। তাঁর স্মরণ সভায় ধীরেন দা, ইতিহাসের অধ্যাপক ও কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জানালেন : শ্রীকুমারবাবু, লায়েককে রেখেছিলেন তাঁর কোয়ার্টারে। তাই তাঁর রান্নাবান্নার কাজ করে দেয় যে, অশোক, তার বাসন ধুতে অস্বীকার করে। এটা কোনোদিন জানতে দেননি লায়েককে। সে ঘুমিয়ে গেলে, বেশি রাতে নিজে তার বাসন ধুয়ে রাখতেন। এপ্রিল হলেও ঔরঙ্গাবাদে রাতে ও ভোর হাল্কা ঠাণ্ডা থাকতো তখন। তাঁর ছিল অ্যাজমার প্রবণতা। অসুস্থ মানুষটি আমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে আমার এঁটো থালা ধুয়ে রাখতেন!—এ কথা জানতে পেরে এক অসম্ভব কষ্ট হচ্ছিল সেদিন। ধীরেনদা জানতেন। অথচ তাঁর জীবৎকালে জানাননি আমাকে। আজ ক্ষমা চাওয়ারও যে উপায় নেই আমার। এদেশ এমনই। মনে পড়ে নজরুলের এঁটো বাসন বন্ধু শৈলজা ধুয়ে দিচ্ছেন। লুকিয়ে। কেননা তার মেসে উঠেছেন, সৈন্যবাহিনী থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া তরুণ। উঠেছেন শৈলজা মুখোপাধ্যায়-এর মেসে। কিন্তু মেসের সাহায্যকারী রাজি নয় নজরুলের বাসন ধুতে। অগত্যা শৈলজার বন্ধুকৃত্য!

তখন ছাত্রদের হোস্টেলে আছি। কলেজে এক মাসও হয়নি। একদিন জেনারেল ক্লাসের ভিড়ে পেছন থেকে উঠে দাঁড়ালেন আমার থেকেও এক বয়স্ক ছাত্র। প্রশ্ন: স্যার আপনি রোজা রাখবেন না? প্রাসঙ্গিক ছিল না প্রশ্নটা ক্লাসে। তবু আমি প্রবল উৎসাহে জবাব দিলাম। 'দেখো, যে সমাজে শতকরা ৮০ জন লোক দু'বেলা অন্ন সংস্থান করতে পারে না, সেখানে রোজার সংযম, অবান্তর। আগে তো খাবার থাকবে। তারপর না কৃচ্ছ্রসাধনে খাবার সংযম দেখাবে মানুষ। আরো কীসব বলেছিলাম। কিন্তু এই জবাব ছাত্রটির মনঃপুত হয়নি। আমার বিরুদ্ধে চললো মসজিদে মসজিদে প্রপাগাণ্ডা। সিদ্ধান্ত হলো : এই নতুন প্রফেসর সি.পি. এম., ধর্ম মানে না। রোজা রাখার লোককে কুকুর বলেছে। স্থানীয় এক তথাকথিত কংগ্রেস নেতা তাঁর মদ্যপবাহিনীকে পাঠিয়ে নেতাজী মোড়ের আগে এক সন্ধ্যায় ঘিরে ধরে অপমান করলে। সঙ্গী সহকর্মীর পরামর্শে জনতার দাবি অনুযায়ী প্রিন্সিপ্যাল স্যারের কেয়ার্টারে যেতে হলো। তাঁর অনুরোধে সেই মাতাল চিৎকারকারীদের দাবি অনুযায়ী ক্ষমা চাইতে হলো আমাকে : 'আপনারা যে বলছেন, আমি বলেছি, যারা রোজা রাখে তারা কুকুর। একথা আমি বলিনি। তবু আপনারা যদি একথায় আঘাত পেয়ে থাকেন তবে আমি ক্ষমা চাইছি।' কোনো যুক্তি তর্কে না গিয়ে এবার তারা চলে গেল। '...চল, চলবে ক্ষমা চেয়েছে।' স্যারের কাছ থেকে জানলাম, 'ওরা মারাত্মক ঘাতক জাতীয় মানুষ।' হাতের হেসো দিয়ে মাথা নামাতে কোনো অসুবিধা নেই ওদের। এপারে

খুন করে নদী পেরিয়ে বাংলাদেশ চলে গেলে আর কেউ কিছুই করতে পারবে না। স্যারের মধ্যস্থতায় সেদিন উত্তেজিত জনতা ফিরে গিয়েছিল বলে আজ বসে স্মৃতিচারণা করছি।

মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছিলাম। স্যারকে বলে দিন সাতেকের ছুটি নিয়ে চলে গেলাম কলকাতা। কলেজ সার্ভিস কমিশন অফিস। তখন সেটা ছিল, রাসবিহারী এভিনিউতে। বাসন্তীদেবী কলেজের একটা অংশ। যাঁরা ঔরঙ্গাবাদ পাঠাতে মোলায়েম সুরে বলেছিলেন খুব ভালো জায়গা। কোনো অসুবিধা হবে না ওখানে জয়েন করুন। আমার সমস্যা শুনে তাঁরা প্রায় ঠাণ্ডা স্বরে বললেন, চাকরি দেওয়াটা আমাদের কাজ। রক্ষা করাটা আপনার। আপনি রিজাইন করে পরের বছরের জন্য আবেদন করতে পারেন। অথচ কলেজে আসার আগে আমার ৪ বছরের পার্মানেন্ট স্কুল চাকরিতে রিজাইন দিয়ে এসেছি।

চুপ করে ফিরে এলাম কলেজে। জয়েন করে ক্লাসে গেলাম। সব ঠিক আছে— এ নিয়ে কোথাও কোনো উচ্চবাচ্য নেই। পরে জেনেছিলাম, সেই স্থানীয় নেতাকে ডেকে আমাদের সহকর্মী অধ্যাপক ড. মুজিবর রহমান সাহেব ধমকে দিয়েছিলেন। তুমি যাকে তোমার মাতাল বাহিনী দিয়ে লাঞ্ছনা করলে, মুসলমান নয় বলে, জানো তিনি মুসলমান সমাজ নিয়ে গবেষণা করছেন। জবাবে ক্ষমাপ্রার্থী সেই নেতা জানান, আর ওরকম হবে না স্যার। আমি কথা দিচ্ছি।

অনেক দিন পরে শুনেছিলাম, কংগ্রেস সেই নেতা সদলবলে নাকি সি.পি.এম.ও হয়েছিলেন। বর্তমানের খবর জানি না আর।

অজস্র সব স্মৃতি ভিড় করে আসে। অধ্যাপক বিদ্যাপতি হালদার, তরুণ সেনগুপ্ত, কিশোর রায়চৌধুরী আর শেখর সেন থাকতেন কলেজের পাশে ঘর ভাড়া নিয়ে একটা মেস করে। প্রফেসর মেস, চেষ্টা হয়েছিল সেখানে আমাকে রাখার। একটা কোনো রুম-এ শেয়ার করে। কিন্তু ২/১ দিনের মধ্যে ওপর তলায় থাকা মালিক জানতে পারলেন অধ্যাপকরা এক নতুন প্রফেসরকে রেখেছে। মুসলমান। ফলে শেখরদাকে ডেকে উনি জানালেন : আমার বাপ ঠাকুরদার জাতধর্মটা রক্ষা করুন। শুনলাম, আপনারা নতুন মুসলমান অধ্যাপককে রাখবেন। পরবর্তী পদক্ষেপ এই নেওয়া হলো যে, ভাই লায়েক, তোমাকে এখানে রাখা যাচ্ছে না। তারপরেই বোধহয়, ছাত্রদের হস্টেলে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। সেই হোস্টেলে থাকাকালে অজিতদা দিয়েছিলেন একটা ছোট টেবিল। একটা হাতলহীন চেয়ার। হোস্টেল ছাড়ার সময়ও ওদুটি আমি চেয়ে নিয়ে আসি ঔরঙ্গাবাদের বাসায়। ফেরত দিইনি। আজও এই স্মৃতিকথা লিখছি, আশ্চর্যজনকভাবে সেই চেয়ার ও টেবিলে বসে। বড় চেয়ার বড়ো টেবিল ছেড়ে এতেই আজও আমার কলম চলে ভালো। লিখতে বেশ সুবিধে হয়। সত্যি।

আজ তরুণদা নেই। বড়ো শুভার্থী ছিলেন আমাদের। পলিটিক্যাল সায়েন্স-এর অধ্যাপক হলেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পড়াশুনা ছিল। 'এক্ষণ' পত্রিকার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। এক্ষণের সৈয়দ মুজতবা আলী সংখ্যা তিনি আমাকে দেখতে দেন। অসাধারণ গান গাইতেন। একবার ধুলিয়ানে, বন্দনাদি (তাঁর স্ত্রী) যেখানে লাইব্রেরিয়ান ছিলেন নিয়ে গিয়েছিলেন আমাকে একটা রবীন্দ্র সন্ধ্যায়। আমার বক্তৃতা ধুলিয়ানের লোকজনকে শোনাবেন তাঁরা। সেদিন সন্ধ্যাটা বড়ো ভালো কেটেছিল তাঁদের সঙ্গে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসার সময়ও তিনি বড়ো খুশি হয়েছিলেন, পশ্চিম মেদিনীপুরে তাঁর ছেলে জয়েন করলো সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসেবে। তার জয়েনিং-এর সময় বন্দনাদিকে নিয়ে এসে উঠেছিলেন রাখহরি পালের কাছে। রাখহরি, যিনি ছিলেন ওখানে ম্যাথেমেটিক্স-এর অধ্যাপক। পরে চলে আসেন মেদিনীপুরের মানিকপাড়া কলেজে। খড়্গপুরে রাখহরির ওখান থেকে দুজনে এলেন আমাদের কাছে। তাঁদের মধ্যে কোনো রিচ্যুয়্যাল পালনের গোঁড়ামি দেখিনি।

তাঁর সহসা চলে যাবার খবর পেয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় বিদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি এতো দূর থেকে। রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সেরে ফিরছি। গেস্ট হাউসে। সূর্য ডুবেছে। ফোন বাজলো (বিদ্যাপতি হালদার) পকেটে। ধরেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। 'লায়েক, তরুণদা চলে গেলেন।' তাকিয়ে আছি পশ্চিম দিগন্তে ট্যাগোর হিলের পেছনে তখন ডুবছে আশ্চর্য লাল একটা সূর্য। মনে পড়ছিল, আমার বড় মেয়ে তখন খুব ছোটো। তাকে ও ইরাণীকে নিয়ে হাওড়া বেড়াতে যাবার জন্য সকালের ট্রেন ধরতে বেরিয়েছি। রাস্তায় দেখা— তরুণদার সঙ্গে। টাঙা ডেকে কী পরম যত্নে আমাদের তুলে দিচ্ছেন স্টেশনে যাবার জন্য। সদ্য সন্তান হবার পর কলকাতায় তাদের রেখে এসেছেন। বলতেন : বউকে ছেড়ে থাকা যায়, সন্তানকে ছেড়ে থাকা যায় না। কথাটা ইরাণীর খুব পছন্দ হয়েছিল। তাঁর চলে যাবার খরব শুনে একথাই তার মনে পড়লো সবার আগে। সুস্থ দীর্ঘকায় শ্লিম ওই মানুষটা আজ তো সবাইকে ছেড়ে আচমকা চলে গেলেন! কেমন নিঃশব্দে।

তাঁর ভরাট গলায় শুনেছিলাম 'তুমি কি কেবলি ছবি...' গানটা। আজ তাঁর ছবির দিকে তাকালে একথাটাই সুরের বেদনায় শুধু শুনতে পাচ্ছি। শুধুই বাজছে... তাঁর কণ্ঠের গান হয়ে। তুমি কি কেবলি ছবি শুধু পটে লিখা...

[লেখক এই কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক]

■

# ইতিহাসের পাতা থেকে

অধ্যাপক ড. কিশোর কুমার রায়চৌধুরী

১৯৭৫ সালের মার্চ মাস। আমি ডি. এন. কলেজে যোগ দিলাম। কয়েকটা অর্থনীতির ক্লাস নিয়ে স্টাফ রুমে বসে লক্ষ্য করলাম, একদিকে আছেন জগবন্ধু বাবু, বিশ্বনাথ বাবু। অন্যদিকে ধীরেন বাবু। ধীরেনদা বলেছিলেন ভালো করে ক্লাস নেওয়া প্রয়োজন। কারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই আমাদের জীবনে প্রকৃত পথ প্রদর্শক। ধীরেনদার কথা মনে হলেই একটা বিষয় মনে পড়ে। কলেজে অনেকদিন কেটে গিয়েছে। ধীরেনদা অবসর নিয়ে কলেজে কিছু ক্লাস করেন। দীর্ঘদিন কলেজে teacher in charge ছিলেন। আমি Jammu University-তে একটা paper পাঠিয়েছিলাম। 'Child labour in Bengal', Indian Economic Association, paper accept করেছিল। ধীরেনদা বলেছিলেন, Jammu ঘুরে এসো। তোমার লেখা একটু দেখি। মনোযোগ দিয়ে পড়তে পড়তে এক জায়গায় একটু পরিবর্তন করতে বললেন। বললেন, এতে আরও ভালো হবে। paper accept ও Jammu University-তে ভালোভাবে সব কিছু হয়ে গেল। রাতে আমাদের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সনৎ-কে ফোন করলাম। কয়েকটা কথার পর সনৎ বলল, 'কিশোরদা, ধীরেনদা আর নেই।' চমকে উঠেছিলাম। এত আলোচনার কারণ এই যে, এই ছিল আমাদের সঙ্গে সহকর্মী শিক্ষকদের সম্পর্ক। আমরা ছিলাম পরিপূরক। সেই সময় অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রীকুমার বাবু। রসিক মানুষ ছিলেন। আমরা রসিক মানুষের সঙ্গে রসিকতা করার সুযোগ ছাড়িনি। আমাদের মধ্যে বিদ্যা দা (বিদ্যাপতি হালদার) থাকলে রসিকতার মাত্রা উচ্চস্তরে চলে যেত।

আমরা চারজন ১৯৭৫ সালে কলেজে যোগদান করেছিলাম। আমি, অধ্যাপক মঞ্জুর আলী, অধ্যাপক গোপিশ্বর বিশ্বাস আর অধ্যাপক বিদ্যাপতি হালদার। রাতে ওই সময় কলেজ হতো। কমার্স পড়ানো হতো। মনে আছে, একদিন ক্লাস করছি, ছাত্র সংসদের তরফ থেকে সেখ নিজামুদ্দিন ছাত্র প্রতিনিধি হয়ে বলেছিল, 'কলেজে আমাদের বক্তব্য রাখব। ক্লাস ছাড়তে হবে।' এই নিজাম দু-এক বছর আগে মারা গিয়েছে। কিন্তু আজীবন আমার সুবিধায় বা অসুবিধায় সম্পর্ক রেখে গিয়েছে।

একটা পর্যায়ে দাঁড়িয়ে উচ্চারিত হয়, আলোর প্রার্থনা। আমরা কলেজে যোগদান করে সেই উচ্চতর পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। ছাত্রদের মধ্যে এখনো যোগাযোগ আছে আজিজুর রহমান, বেলাল, আনোয়ার, দীপক, ষষ্ঠী, সুমন অনেকেই। এদের সঙ্গে আমার ছাত্রসম বন্ধুত্ব ছিল। আমার ৩৬ বছরের চাকুরিরত জীবনে এসে আমার ছাত্র-বন্ধু হিসেবে এরা ছিল। এদের সঙ্গে কথা বলে আমি সবরকম তামসিকতার হাত থেকে মুক্তি পেতাম। এদের মাধ্যমেই কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, নবীন বরণ—ইত্যাদি আনন্দের দিনগুলি পালন করেছি।

আমি যখন কলেজে যোগদান করি, তখন শিক্ষক মহলে দুটি স্তর। সিনিয়ার শিক্ষকদের মধ্যে ধীরেনদা, শান্তিদা, বিশ্বনাথদা, জগাদা, অজিত দা অন্যতম। কয়েক বছর পর সুনীলদা (সুনীল দাশগুপ্ত),লায়েক, সুজিত যোগদান করে। আমাদের কয়েক বছর আগে মুজিবদা, তরুণদাদের একটা অধ্যায়। যে কোনো আলোচনায় মুজিবদা, আর খেলার মাঠ আলোকিত করতেন তরুণদা (৺তরুণ সেনগুপ্ত)।

আমরা তখন সবচেয়ে উৎসাহ পেয়েছিলাম, অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য মহাশয়ের কাছ থেকে। বিকালে আমাদের কলেজের পাশের মাঠে ব্যাডমিন্টন খেলা হতো। আমরা সবাই খেলতাম। কফি খাওয়া হতো। শ্রীকুমার বাবু খাওয়াতেন।

ব্যক্তি কখনো কখনো প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে। কলেজে সাধন ছিল এই ধরনের। নিজের মতো থাকা, ঝক্‌ঝকে লেখা ও বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা—এই নিয়ে ছিল সাধনের জগৎ। শুদ্ধ আনন্দের বিরল মুহূর্তে সাধন যেন একমুখী প্রতিষ্ঠান।

আমি কলেজে অনেকটা সময় কাটাতাম অফিস ঘরে। দিবাকরবাবু, জালান সাহেব, নজরুল সাহেব, ধ্রুব, হরোজ এদের মধ্যে থাকতে ভালো লাগতো। কাজের মধ্যে, বিভিন্ন গল্পের মধ্যে আমার সময় কাটত। লাইব্রেরিতে সন্তোষবাবু ছিলেন আমাদের আর এক সঙ্গী।

কলেজের পঞ্চাশ বছর পার হলেও আমি এই কলেজে ৩৫ বছর কাজ করেছি। এখনো সম্পর্ক আছে। আমি যখন যোগদান করি তখন বয়স্কদের দেখতাম। তাঁদের কথা আমার ভালো লাগত। আর কালের নিয়মে আমরা যখন বয়স্ক তখন নতুন প্রজন্মের সঙ্গে মেলামেশা করেছি। খেলার চেষ্টা করেছি। সপ্তাহে একদিন করে মিলিতভাবে খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। গল্প, আলোচনা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। কলেজের অনেক সহকর্মী আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। বিশ্বনাথ দা, ধীরেন দা, জগাদা, শ্রীকুমার বাবু, গোপিশ্বর বাবু—এঁরা সবাই কর্মরত অবস্থায় চলে গিয়েছেন। এক বছরের মধ্যে আরও দুঃসংবাদ পেলাম। তরুণদা এবং প্রতনু চলে গেলেন।

কলেজে আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও উপলব্ধিগুলিকে কার্যকর করার চেষ্টা ছিল। ক্লাসে, খেলার মাঠে এর প্রতিফলন ঘটত। আনন্দ ও সুস্থতার পথে আমরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। শিক্ষকদের অনেকেই এই কলেজ থেকে অন্য উচ্চতর শিক্ষা পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের অনেক ছাত্র-ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্থান অধিকার করে উচ্চতম স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু ঔরঙ্গাবাদে অসুস্থ পথ ছিল। যোগাযোগ অব্যবস্থা, বন্যার তাণ্ডব ইত্যাদি বাধাগুলি পশ্চিমবঙ্গে অন্য কলেজের চেয়ে বেশি ছিল। উচ্চতর মানসিক শক্তি এইসব অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।

এখনো কোনো কোনো প্রয়োজনে আমি আমাদের কলেজে যাই। টেবিলের পাশে চেয়ারগুলি যেন আমাকে ডাকে। মনে পড়ে, ধীরেনদা, জগাদা, শ্রীকুমার বাবু, গোপেশ্বর বাবুর কথা। তরুণ দা ও প্রতনুকে খুঁজি। একটা নস্টালজিয়া। মনে হয় বাড়ি, ঘর, টেবিল, চেয়ার নয়—আসল বিষয় শিক্ষক সমাজ ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। যারা আসে যায় কিন্তু রেখে যায় চিরকালীন সম্পর্ক যা মরে যায় না, ভেঙ্গে যায় না। অবসর গ্রহণের প্রায় সাত বছর পরেও আমাদের ডি. এন. কলেজকে ভুলতে পারিনি। পারা যায় না। যেখান থেকে পেয়েছি আনন্দের পথ, সুস্থতার পথ তার সঙ্গে মানসিক শক্তি যা আমাদের যুক্তিবোধকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

ডি. এন. কলেজের একটা পর্যায় নিয়ে লেখা কিছুটা তুলে ধরলাম। কালক্রমে আমরা দাদা হলাম এবং সিনিয়র হলাম। অনেক নতুন নতুন অধ্যাপক যোগদান করলেন। সরকারি নিয়মে শিক্ষকদের ও কলেজ কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়ল। ছাত্র পড়ানো, কলেজের অন্যান্য কাজ শেষ করেও আমরা কলেজে সময় কাটাতাম। আলোচনা, খেলা ছাড়াও আমাদের 'বুধবার ক্লাব' ছিল। বিশেষ করে প্রতনুর ঘরেই রান্না হতো। অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হতো। আমাদের কলেজের গোটা দিনটাকেই আমরা স্বর্গীয় পরিবেশে উন্নীত করতাম। আমি আলাদা করে কোনো সহকর্মীর নাম করছি না। আমাদের ছিল একটি পরিবার। অবসরের ছয় বছর পরে ওই দিনগুলো বেশি করে মনে পড়ছে। তবে প্রতনুর নাম এসে যাচ্ছে। খেলার মাঠ, ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ, কলেজের যে-কোনো প্রোগ্রামে প্রতনু এগিয়ে আসত। এত হাসি, এত আনন্দ নিয়ে থাকত—কিন্তু কি যে হল, চলে গেল প্রতনু, আমাদের ছেড়ে, সকলকে ছেড়ে।

কলেজের কথাই মনে হয়। এই বয়সে এটাই হয়তো নিয়ম। একাকী লাগে, কারণ আমার দুঃখ বা আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার জন্য কাউকে পাই না। এত পথ পেরিয়ে এসেও স্পর্শ করেনি এই কলেজকে। পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে জরাগ্রস্ত নয় এই কলেজ। আধুনিকতার স্পর্শ গায়ে মেখে নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে চলেছে আমাদের এই কলেজ। ■

'মনুষ্যত্বের শিক্ষাটাই চরম শিক্ষা আর সমস্তই তার অধীন।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# তরুণ দা

## ড. কিশোর কুমার রায়চৌধুরী

কয়েকদিন আগেই দুপুরে আমাদের ছাত্র বেলালের ফোন। দুটো একটা কথা বলার পর বেলাল বলল, 'স্যার, তরুণবাবু চলে গেলেন।' চমকে উঠলাম। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্থ ব্যক্তি এইভাবে চলে গেলেন? আমার এক বছর আগে তরুণদা (তরুণ সেনগুপ্ত) ডি. এন. কলেজে যোগদান করেন। কলেজে আমার যোগদানের পর তরুণদার সঙ্গে প্রথম কথা, 'তুমি কিশোর—শুভেচ্ছা'। আমি বললাম, 'কোথায় আছেন?' তরুণ বলেছিল, 'নিমতিতা স্টেশনের কাছে একটা পুরোনো বাড়িতে। ছুটির দিন গেলাম। বুঝতে পারছিলাম না, কোন বাড়িতে তরুণদা থাকেন? একটা বাড়ির সামনে হারমোনিয়ামের আওয়াজ। তরুণদা গান গাইছেন। ওই হারমোনিয়াম সব সময় তরুণদার কাছে থাকত।

কলেজের কাছে আমরা কয়েকজন কলেজ শিক্ষক একটা বাড়িতে থাকতাম। তরুণদা এসে গেলেন ওখানে। বিদ্যাদার (অধ্যাপক বিদ্যাপতি হালদার) ঘরে তরুণদার থাকা। সকালে কমার্সের ক্লাস থাকত। ঘুম ভাঙত তরুণদার রেওয়াজের শব্দে। সুনীলদা (সুনীল সেনগুপ্ত), আমি, বিদ্যাদা, তরুণদা, শেখরদা (শেখর সেন)—আমরা একই ছাদের তলায় থাকতাম। পরে সুজিত (সুজিত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়) আমাদের মেসে আসে। কাজের শেষে আলোচনা আমাদের খুব প্রাণবন্ত ছিল। আমাদের মেসের পাশের বাড়িতে মুজিবদা থাকতেন। সারাদিন কলেজে ক্লাস নেওয়া, বিকালে মাঠে খেলা, আবার রাতে যে যার ঘরে পড়াশোনা। কলেজে বাৎসরিক sports-এ ক'দিন আগে তরুণদা মাঠ নিয়ে ব্যস্ত। sports-এর শেষে শিক্ষকদের সামান্য দৌড় প্রতিযোগিতা। আমরা তৃতীয় হওয়ার চেষ্টা করতাম। কারণ প্রথম তরুণদা, দ্বিতীয় জালাল সাহেব—এরপর প্রতিযোগিতা।

তরুণদার উদ্যোগে একবার আমরা ঠিক করলাম, জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎসিংহ কলেজের সঙ্গে আমাদের কলেজের শিক্ষকদের মধ্যে ফুটবল খেলা। নির্দিষ্ট দিনে আমরা গেলাম জিয়াগঞ্জে। খেলা হচ্ছিল, জিয়াগঞ্জ কলেজের কানুদা (মুর্শিদাবাদ জেলায় খেলতেন) আর আমাদের কলেজের তরুণদা (মালদা জেলায় খেলতেন)। মাঠের মধ্যেই বিদ্যাদা মজা করছিল। জিয়াগঞ্জ কলেজের গোলের কাছেই আমি ছিলাম। হঠাৎ তরুণদা একটা বল কাটিয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে, অনেক চেঁচিয়ে বলল—'কিশোর সোজা মারো।' গোল হয়ে গেল। পরের গোল এককভাবে তরুণদার কৃতিত্ব। অনেক খাওয়া-দাওয়া মজা হয়েছিল সেদিন শ্রীপৎসিংহ কলেজে।

আর একটি ঘটনা। জিয়াগঞ্জের মাঠে শ্রীপৎসিংহ কলেজের সঙ্গে আমাদের কলেজ শিক্ষকদের ক্রিকেট খেলা। আমাদের ক্যাপ্টেন তরুণদা। খেলা আরম্ভ হওয়ার আগে আমাদের কে কোন স্থানে খেলবে, তা ঠিক করে দিল। কিন্তু আমাদের খেলোয়াড় কমে গেল। সাধনকে অনেক বলার পর তরুণদার রিকোয়েস্ট অমান্য করতে পারল না। তাও প্লেয়ার কম। আমার বন্ধু জিয়াগঞ্জের প্রবীর সিংহ চৌধুরীকে হাইয়ার করা হলো। খেলায় যথারীতি তরুণদা, প্রবীর ও শ্রীপৎসিং কলেজের কয়েকজনের খেলা হলো। ওই কলেজে খাওয়া-দাওয়া, আবার রাতে ফেরা।

খেলা, গান, ছাত্র-পড়ানো এই নিয়ে আমাদের ভালোই কাটত। পরে তরুণদা ধুলিয়ানে বাড়ি করে চলে যান। ওখান থেকেই কলেজে আসতেন। কলকাতা থেকে বিদেশ বসু একবার আমাদের কলেজে খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন। বিদেশ বসুর সম্মানে বক্তৃতা করতে হবে। এখানেও তরুণদা। কলকাতা মাঠের খেলা নিয়ে তরুণদা সুন্দর আলোচনা করলেন।

৪২ নং পৃষ্ঠায় দেখুন

# সংগীতা

শিশির কুমার দাস

হৃদয় বেদনাতুর, তন্দ্রাঘোর অবসাদ।
ভাবনা আমার—সোমরস সেবন জর্জর
নিঃশেষে করেছি পান। নেশার আস্বাদ,
সময় অতীত, ডুবিতেছি অন্ধকারে 'নদী বিস্মৃতি'র :
ছায়াস্নিগ্ধ বনতলে সবুজে শ্যামলে
বনলক্ষ্মী ভ্রমিতেছে ফুল হ'তে ফুলে।
পরশ্রীকাতর নই তোমার সুখেতে
তোমারই সুখে সুখী। ঝরে অশ্রুধারা,
আনন্দ অধীর আমি, হে সংগীতে!
গ্রীষ্মের আগমনী শুনি—হয়েছি আপনহারা।

অন্ধকারে ঘুমে অচেতন মদিরা পরশে
তন্দ্রালস পাতাল গহ্বরে হ'ল ঘুমভাঙ্গা।
আনন্দ হিল্লোলে উদ্বেলিত বসন্ত বাতাসে
ধরণীর ধূলিতল রঙে হোক, রাঙা।
আরক্তিম ফেনিল উচ্ছ্বাসে যৌবনের ফুলবনে
মিটাইব আশা লজ্জারুণ অধর চুম্বনে;
পানপাত্র করি পূর্ণ, ভুলি বেদনায়,
আকণ্ঠ পিপাসায় পাষাণ নির্ঝরে—
আনন্দের সহচরী সাথে অরণ্যের নিভৃত ছায়ায়
যা'ব চলে কল্পনার স্বর্গলোকে দিগন্ত আঁধারে।

নিয়ে চলো তুমি মোরে দূর দূরান্তরে,
পারি না সহিতে আর ত্রিতাপ সন্তাপ।
আমি অসহায়, শুধু ব্যর্থ হাহাকারে
স্মরণের বীণে বাজে করুণ বিলাপ।
বার্দ্ধক্যের বিষাদসিন্ধু, যৌবনের পুষ্পকীট,
এ জীবন—মরণের কন্টক-কিরীট।
পক্ষাঘাত পঙ্গু প্রাণ, রাত আর দিন
চিন্তাব্যাধি হতাশার শুধু কাল গোণা
রিক্ত শুষ্ক এ ধরণী ধূলিতে মলিন
ব্যর্থ প্রেম সৌন্দর্য সাধনা।

আর নয়। শূন্য ধরা তোমায় বিদায়।
কুহকিনী মদিরা সঙ্গিনী চায় না তোমায়।
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গম কল্পনার রঙিন পাখায়
চলিলাম। সংগীতা রয়েছে সেথা মোর প্রতীক্ষায়।
মোহময় বনান্তর আলোক প্রভায়
সাজিয়াছে অপরূপ, চাঁদে ঘিরি তারায় তারায়।
ছায়াঘন তরুতল কানন আননে
অবগুণ্ঠন খোল তার পবন হিল্লোল।
জোনাকীর ঝিকিমিকি শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
শুচিস্মিতা ইশারায় কটাক্ষ বিলোল।

ফোটে ফুল জলে স্থলে অন্তরীক্ষে নভে,
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে, অন্ধকার কোণে।
সুরভিত অভিসার দিকে দিগ্বিদিকে
আমারে জড়ায়ে আছে বাহুর বাঁধনে।
ইন্দ্রধনু রঙে আঁকা প্রজাপতি পাখা,
অলক্ত রঞ্জিত রাগ মধু স্বপ্ন মাখা।

লাজুক গোলাপ ফুল কমল কানন,
অনিন্দ্যসুন্দর চন্দ্রমল্লিকার বাগে—
কত সুর কত গান প্রিয় সম্ভাষণ
মধুকর ব্যস্ত আজি সান্ধ্য-চন্দ্রাতপে

আবেশ জড়ানো আঁখি, চেতনা আচ্ছন্ন মন,
কাকলীর গান আসে ভেসে আঁধার অম্বরে।
চির শান্তি মহাপ্রেম দাও লিখে ললাট লিখন,
হে প্রেয়সী, নিয়ে চলো মৃত্যু পরপারে।
বক্ষে ধরি প্রশান্ত সমীরে নদী ধায় সমুদ্র-সন্ধানে,
মৌন মুক চেয়ে আছি স্থির শান্ত দিগন্তের পানে।
এস তুমি মৃত্যুদুত নয়নাভিরাম।
শ্রবণ শুনে যাক্ সংগীতার সে মহাসংগীত
জীবনের শেষ গানে লহ আজি কবির প্রণাম।
মহালগ্ন আসুক ঘনায়ে নিভে যাক্ জীবনপ্রদীপ।

অবিনাশী সংগীত প্রবাহ নিত্য আসে ভেসে—
অতীতের শিল্পকীর্তি করি অনাদৃত
প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করে হিংসার আক্রোশে।
স্বার্থমুক্ত হে বিহঙ্গ জানাই স্বাগত।
অতীতের দ্বার হ'তে যাত্রা তব মহাকাল বাহি
কত নদী নির্ঝরিণী মহাম্বুধি রহে পথ চাহি
দরশ পরশ মানি ভক্তি অর্ঘ্য তুলি
ভাবে ভোর তোমার সংগীতে জাগে সুখ
বিরহিত মরমের দুঃখ গ্লানি ভুলি
সুর-সুন্দরীরা বাতায়ন পথে তাই প্রতীক্ষা-উন্মুখ।

স্বপ্ন দেখা হ'ল শেষ! তন্দ্রালস প্রভাত সমীরে,
বাস্তবের মরুভূমে—কল্পনার রচি মরীচিকা
ব্যর্থ আমি খুঁজি ফিরি তৃষ্ণা মিটাবারে।
তপ্ত তনু ক্লিষ্ট প্রাণ : তুমি ক্ষণপ্রভা।
ধূলার ধরণী মোর তুমি সুর দিগন্তব্যাপিকা;
মোহভঙ্গ জীবনের তটে আমি শুধু একা।
মগ্ন ছিনু প্রেমে তব—আমি অবাঞ্ছিত,
রুক্ষ্ম বিষ-বাষ্পাচ্ছন্ন আমার আকাশ
ভালোবাসা হ'তে তাই চির নির্বাসিত,
এ জীবন হতাশার শুধু দী-র্ঘ-শ্বা-স।

*(প্রাক্তন ছাত্র, অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধানশিক্ষক)*

---

'স্বপ্ন বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে। আর স্বপ্ন সেটা নয় যেটা তুমি ঘুমিয়ে দেখ, স্বপ্ন হল সেটাই, যেটা পুরণের প্রত্যাশা তোমাকে ঘুমাতে দেয় না'।

—এ. পি. জে. আব্দুল কালাম

# অরঙ্গাবাদ ও নাট্যোৎসব

## দিলীপ চৌধুরী

নাট্যোৎসবের স্মৃতি রোমন্থন যদি করি, তবে ১৯৮৮ সালের ষ্টুডিও ছবিঘর এবং দাস ডেকোরেটরের উদ্যোগে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার কথা স্মৃতির দরজায় আজও বার বার নাড়া দেয়। মনে পড়ে যায় একাঙ্ক নাটকের ইতিহাসে একজনের নাম—তিনি আর কেউ নন, তিনি 'দিগম্বর মুখার্জি'। সুতি-২ ব্লকের BYO অর্থাৎ ব্লক যুব আধিকারিক। তিনি আজ আমাদের মধ্যে নেই, না থাকলেও আমাদের চলার পথে তাঁর ছায়া সব সময় দেখতে পাই। ১৯৮৮ সালের নাট্যোৎসবের গাড়ির ষ্টেয়ারিং হিসাবে কাজ করেছেন, 'দিগম্বর মুখার্জি'। উনার পরিকল্পনা, চিন্তা ভাবনা আজও এই এলাকার নাট্যমোদি দর্শকদের আলোচ্য বিষয় হিসাবে উঠে আসে।

১৯৮৮ সালের নাট্যোৎসবের এই নান্দনিক প্রয়াস এতদঞ্চলের গৌরবময় ঐতিহ্যে আর এক নবতম সংযোজন। একাঙ্ক নাটকের উৎসব সেবারই অরঙ্গাবাদে তাঁতিপাড়া রথতলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেবার ১১টি নাটকের প্রদর্শনী করা হয়েছিল। রথতলা ময়দানে ১১টি নাটকের শতাধিক কলাকুশলী তাঁদের পরিশীলিত অনুশীলনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সমবেত দর্শকবৃন্দ তা ধৈর্য্যের সঙ্গে দেখেছেন এবং আজও তার প্রশংসা শোনা যায়।

**নাটক ও নাটকের দলগুলি :** লালবাগের মালঞ্চ নাট্য সংস্থার নাটক 'সত্যম শিবম সুন্দরম'। তাঁতিপাড়া নাট্য গোষ্ঠীর অভিনীত নাটক 'এখনো অন্ধকার'। সম্বিৎ (অরঙ্গাবাদ) এর মনোজ মিত্রের লেখা 'তেতুঁল গাছ', নির্দেশনায় দিলীপ চৌধুরী। এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব, দফাহাট অভিনীত 'অবাক পৃথিবী', নির্দেশনায় হরিপদ রায়। কানন নাট্য সংস্থা (অরঙ্গাবাদ) এর অভিনীত বিদীশ। বিষ্ণুপুর গ্রামীন পাঠাগার সাগরদীঘি অভিনীত 'আর এক সেলিমা'। জালালপুর বিধান পাঠাগার (মালদা) অভিনীত 'শিব ঠাকুরের আপন দেশে'। জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশন (ফরাক্কা) অভিনীত দুলাল চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক, 'মানুষ শুধু মানুষ'। মালদা কালিয়াচকের কোরাস নাট্য সংস্থার নাটক 'একটি অবাস্তব গল্প'। চরি অনন্তপুর (মালদা) এর অগ্নিশিখা নাট্য সংস্থা এবং পরিমল ত্রিবেদী নির্দেশিত নাটক 'জীবন যাপন'। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব (আজিমগঞ্জ) অভিনীত নাটক মনোজ মিত্রের 'কাক চরিত্র'।

নাটকের জাজমেন্ট করেছেন শিশির কুমার দাস মহাশয় (নিমতিতা), শ্রদ্ধেয় জীবেন্দ্র কৃষ্ণ গোস্বামী (জগতাই) এবং মাননীয় শ্রী মলয় কুমার গুপ্ত (অরঙ্গাবাদ)। সর্বোপরি নাটক প্রতিযোগিতায় শেষের দিন প্রতিযোগিতার ফলাফল এবং নাটকের ভুল ত্রুটি সবদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন শিশির কুমার দাস। নাটকের সমালোচনা শুনে আমরা তো বটেই, বাইরের নাটকের দিকপাল যাঁরা এসেছিলেন, প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। শিশিরবাবু লিখেছেন, চারদিন নাটক দেখেশুনে মনে হলো স্থানীয় দলগুলি বহিরাগত দলগুলির চেয়ে গুণগত, প্রযুক্তিগত, মানে অনেক পিছনে পড়ে আছে। অনেক অনুশীলন দরকার। এখন সংলাপ সেকেন্ডের কাঁটাকে, ভগ্নাংশের অঙ্ককে ভেঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলেছে। সংলাপ মুখস্থ না থাকলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অভিনয়ে মনোনিবেশ করতে পারে না।

স্থানীয় দলগুলির মধ্যে অরঙ্গাবাদের কানন নাট্য সংস্থার 'বিদিশ', তাঁতিপাড়া নাট্য গোষ্ঠীর 'এখনো অন্ধকার', সম্বিৎ-এর 'তেঁতুল গাছ' ভালো নাটক হলেও প্রযোজনায়, মঞ্চ সজ্জায়, অভিনয়ে মন জয় করতে পারেনি। বিদিশ নাটকে দেবু (জগন্নাথ

রায়), সমর (রামকৃষ্ণ সরকার), কমল (খোকন দাস), মিস্টার দত্ত (কাঞ্চন ঘোষ), ইত্যাদি বিভিন্ন ভূমিকায় প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। 'এখনো অন্ধকার' নাটকে বিষ্ণু সর্দারের ভূমিকায় কৃপাসিন্ধু দাস, অন্তা চাকরের ভূমিকায় প্রভাত সেন এবং ফকিরচাঁদবেশী নারায়ণ চন্দ্র দাসের অভিনয় মনে রাখার মতো। সম্বিৎ (অরঙ্গাবাদ) এর 'তেঁতুল গাছ' স্থানীয় দলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা। দুটি শক্তিমান নটের জুটি দিলীপ চৌধুরী এবং বাপী সরকার মিলে এক দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছেন। এঁদের আবহ সঙ্গীত পরিবেশনা ও আলো বেশ ভালো। স্থানীয় প্রযোজনার আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম সুতি-২ নং ব্লকের এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'অবাক পৃথিবী', সামাজিক সমস্যাক্লিষ্ট নানান চরিত্রকে তুলে ধরার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন পরিচালক হরিপদ রায়। অধিপ মুখার্জির চরিত্রে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, তাছাড়া সন্দীপ ভট্টাচার্য, সমর সিংহ, মানিক মুখার্জি, কৃপাসিন্ধু চক্রবর্তীর অভিনয় ভালো। একটি পরিছন্ন চরিত্রে সত্যব্রতের ভূমিকায় তপন চক্রবর্তীকে সুন্দর মানিয়েছিল। বহিরাগত নাট্য কুশীলবরা ভালো নাটক এবং অভিনয় যে করেছেন তার প্রমাণ এলাকার লোক। কাকচরিত্র, জীবন যাপন, মানুষ শুধু মানুষ নাটকে তাদের স্মৃতিসৌধ গড়ে গেছেন।

১৯৮৮-এর নাট্যোৎসব বাদ দিয়ে ২০১৪ সালের নাট্যোৎসব লিখতে গেলে যেন মনে হয় কোথাও ভুল থেকে যাচ্ছে। ২০১৪ এর সূচনার শুভারম্ভে সুতী সংস্কৃতি মঞ্চের জন্মলগ্নে শঙ্খধ্বনি, সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করে পল্লির প্রাঙ্গনে শহরের অঙ্গনে এসে পৌঁছেছে। শত শত ছাত্র-ছাত্রী সংস্কৃতি ভাবাপন্ন মানুষের গৌরবোজ্জ্বল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এলাকার মানুষকে জানান দিচ্ছে—সবারে করি আহ্বান, এসো মিলি নাট্য ও সাংস্কৃতিক মিলন উৎসবে। ১লা, ২রা, ৩রা ফেব্রুয়ারি ২০১৪, মহা ধূমধামে হয়ে গেল তাঁতিপাড়া রথতলা ময়দানে নাট্যোৎসব।

১লা ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। ২টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও আনুষ্ঠানিকভাবে নাট্য ও সাংস্কৃতিক মিলন উৎসবের সূচনা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের আহিরন শাখার প্রিন্সিপ্যাল মহ. জুনাইদ এবং সুনীল দে মহাশয় (সহকারী অধ্যাপক ডি. এন. কলেজ), ইমানি বিশ্বাস (এম.এল.এ.), দীপক দাস। সন্ধ্যা ৬টায় রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা এবং প্রতিদিন নাটক স্থানীয় এবং বহিরাগত দলদের নিয়ে, মোট সাতটি নাটক হয়ে গেল। প্রথমদিন নাটক - প্রজা মাহাত্ম্য, পরিবেশনে মহাদেবপুর আর্ট এ্যান্ড কালচার, মালদা, নির্দেশনা - গোপাল ছেত্রী। দ্বিতীয় নাটক - অরূপ কলা, রচনা - অতনু বর্মন, নির্দেশনা - মুকুল সিদ্দিকি, পরিবেশনে আত্মজ, সিউড়ী, বীরভূম।

দ্বিতীয় দিন নাটক গভীরা। রচনা ও নির্দেশনায় পরিমল ত্রিবেদী (সদস্য পশ্চিমবঙ্গ নাট্য একাডেমী), পরিবেশনায় মালঞ্চ নাট্য সংস্থা (মালদা)। ২ ঘন্টার দ্বিতীয় নাটক আকালের দেশে। রচনায় বিমল রায়, নির্দেশনায় প্রবীর রায় এবং পরিবেশনে কালিয়াচক সাংস্কৃতিক মঞ্চ (মালদা)। তৃতীয় দিন নাটক 'দিশা', রচনা - হরিপদ রায়, নির্দেশনা - দিলাপ চৌধুরী, পরিবেশনে সুতী সংস্কৃতি মঞ্চ (অরঙ্গাবাদ)। নাটক 'কৃষ্ণ প্রাপ্তি', রচনা - সোমেন পাল, নির্দেশনা - নারায়ণ মণ্ডল, পরিবেশনায় রঘুনাথগঞ্জ নাট্য নিকেতন (জঙ্গিপুর)। নাটক 'সত্যি ভূতের গল্প', রচনা - মনোজ মিত্র, নির্দেশনা - পলাশ দাস, পরিবেশনায় - তাঁতিপাড়া মিলন সংঘ।

নাটকগুলো বিশেষ করে বহিরাগত নাট্য দলগুলি যে পর্যায়ে অভিনয় করে গেল, আমার পক্ষে সমালোচনা করা সত্যি অন্যায়। তবু দর্শক হিসাবে কিছু বলা যেতেই পারে। স্থানীয় দু'টি দল তাঁতিপাড়া মিলন সংঘ এবং সুতী সংস্কৃতি মঞ্চ (অরঙ্গাবাদ)। প্রথমত, নাটক করার যে মানসিকতা সেটাই ছিল না। কেউ করতে বলেছে—চল করি, ধরনের ভাবনা। সেই কারণে আমার কাছে ছন্নছাড়া লেগেছে। অভিনয় করার ক্ষমতা নেই, এটা অবশ্যই নয়। অভিনয়ের ক্ষমতা অনেকেরই আছে। মুখস্থ করা, প্রতিদিন রিহার্শাল করা, একটা নাটক করতে গেলে তার পেছনে সময় দেওয়া খুব প্রয়োজন। নাটক নিয়ে চিন্তা করা, নাটকটি কি বলতে চাইছে, লেখক কি বলতে চান সেটা সম্বন্ধে ভালো করে জানতে হবে। এককথায় নাটকের সাধনায় মনোনিবেশ করতে হবে, তবেই তার ফল ভালো পাওয়া যাবে।

অনেক জ্ঞান দেওয়া হলো। আমাকে ক্ষমা করবেন। দুটো নাটকের লেখকের চিন্তা ভাবনা খুব ভালো ছিল। মানুষ খুব ভালো ভাবে নিয়েছেন। নাটকের মাধ্যমে সমাজ চেতনা বাড়ানো যায়। হয়তো তার কিছু কাজ আমাদের অজান্তেই করে ফেলেছি। 'সত্যি ভূতের গল্প'-এ শেষ দৃশ্যে ইহলোকে কু-কাজ করলে পরজন্মে গরুই হয়। দৃশ্যটাও বেশ ভালোভাবে দেখানো হয়েছে। অবশ্যই খুব সুন্দর হয়েছে। 'দিশা' নাটকে (যদিও আরও ভালো হওয়া দরকার ছিল)। রমার চরিত্রে পান্নি সরকার কিছুটা ভালো অভিনয়ের দাবি রেখেছে। নাটক ভালোই হয়েছে। আশাকরি, আগামীদিনে আরও ভালো হবে। লেখক হরিপদ রায় সমাজ গঠনের জন্যে, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে যে জেহাদ ঘোষণা করেছেন তার প্রতিরোধ যদি একটুও গড়ে ওঠে, তবেই নাটকের অভিনয় ও নাটক লেখা সার্থক হয়ে উঠবে।

সিউড়ির আত্মজ অভিনীত 'অরূপ কথা', মুকুল সিদ্দিকির অভিনয় মনে রাখার মতো। বহুরূপী জাতীয় শিল্প আজ সংকটাপন্ন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুরূপী পড়েছি। এক সময় এই শিল্পের রমরমা ছিল। আজ নেই। আবার আধুনিক জগতে ধরে রাখাও যায় না। এর লড়াই সত্যি সকলকে ভাবিয়ে গেছে। নাটক 'প্রজা মাহাত্ম্য'-তে গোপাল ছেত্রী, তার পুরো দলই আমাদের এলাকায় নাটকের ধামাকা দিয়ে গেছে। এবার একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক উপহার দিয়েছেন পরিমল ত্রিবেদী। 'গম্ভীরা গম্ভীরা' , রচনা ও নির্দেশনা পরিমল ত্রিবেদী। সেখানেও দেখানো হয়েছে গম্ভীরা গানের শিল্পীরা কি পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। সে শিল্পের বাজার আর নাই। তাই দলাদলি, ভেঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে দলগুলো। প্রত্যেক অভিনেতা অভিনেত্রীদের পেশা দায়িত্ব ফুটে উঠেছে। সকলেই নাটককে ভালোবেসে নাটকের জন্য মনপ্রাণ দিয়ে দিয়েছেন। সকলেরই অভিনয় তুলনা হয় না। জঙ্গিপুর র-না-নী'র অবশ্যই বর্তমান যুগোপযোগী নাটক। নাটকের পরিচালক নারায়ণ মণ্ডল নিজে বিশাল মাপের অভিনেতা এবং গায়ক। উনার গানের গলাও খুব ভালো। নাটক পরিবেশন, আলো, মঞ্চসজ্জাও খুব ভালো। এবার থাকলো কালিয়াচক—এদের এ বছরের নাটক 'আকালের দেশে',মোটামুটি সকলেরই অভিনয় ভালো। বইটির গল্পটাই একটু ঝিমানো। গতি কম ছিল। এলাকার লোক তবু নিয়েছে।

সব নাটকগুলো দেখে আমার মনে হচ্ছে—পাঁচদিনের ক্রিকেট, একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং এক অঙ্কের নাটক আজকের টি-২০ ক্রিকেট। ৫০-৫৫ মিনিটের মধ্যেই নাটকের সব রস, গন্ধ এবং গল্পের গতি আনতে হবে। ধ্রুপদী রূপের আড়ালে আধুনিকতার বৈচিত্র্য মিশ্রিত একাঙ্ক নাটক ফাইভ ইন-ওয়ান। রূপে, রসে, স্বাদে আমাদের চেতনায় রঙে রঙে রাঙা হয়ে থাকবে। উৎসব ময়দানে আমরা তিন দিন ধরে আলোকের ঝর্ণা ধারায় অবগাহন করলাম। তারজন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই সুতি সংস্কৃতি মঞ্চের সভাপতি ইমানি বিশ্বাস (MLA), সম্পাদক সহ প্রতিটি সদস্যকে, যাঁরা অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে এই উৎসবটা সফল করে তুলেছেন।

**(লেখক প্রাক্তন ছাত্র)**

# তরুণ দা

৩৭ নং পৃষ্ঠার পর

এই ছিল আমাদের তরুণদা। মৃত্যুর একমাস আগেও আমাকে ফোন করেছিলেন। কোনো একটা ইনফরমেশনের জন্য। কথা হলো। জানতাম না, তরুণদার সঙ্গে ওটাই আমার শেষ কথা।

বিদ্যাপতি বাবুর ছেলের বিয়েতে তরুণদার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কোনোরকম শারীরিক বা মানসিকভাবে ক্লান্ত লাগেনি। আমার কলেজ থেকে অবসর নেওয়ার পর তরুণদার সঙ্গে সেভাবে আর দেখা হয়নি। জীবনের একটা পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে আমরা কেমন যেন হারিয়ে যাচ্ছি, এই প্রচলিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে। কখন যে বিদায়ের দিন চলে আসে বোঝা যায় না। ডি. এন. কলেজে গেলে স্টাফ রুম, খেলার মাঠ, লাইব্রেরির দিকে গেলে আমাদের সেইসব দিনের বন্ধুদের খুঁজি, মনে করার চেষ্টা করি আমাদের যৌবনের দাপটের দিনের এক একটা ঘটনা।

কিন্তু কালের নিয়ম। অনুভূতির পার্থক্য থাকলেও সবাইকেই চলে যেতে হবে। তরুণদাও চলে গেলেন। কষ্টকর সত্য হলেও আমরাও অতীত হয়ে যাব।

তরুণদা যে গানটা গাইতে ভালোবাসতেন 'ঝরা পাতা গো, আমি তোমারি দলে'। সত্যি ঝরা পাতার মতো তরুণদা চলে গেলেন এক আকাশ থেকে অন্য আকাশে। এখন দেখব কলেজের বাড়ি আছে, মাঠ আরও ভালো হয়েছে। কিন্তু এই মাঠে তরুণদাকে খুঁজে পাব না। 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। আমাদের অনুভূতির সেই অবস্থা। কলেজে যাব, কিন্তু খুঁজে পাব না তরুণদাকে। মাঠের দিকে, গাছের দিকে তাকিয়ে মনে করব, 'My heart of a sudden / has put on green leaves of desire.' আপনার কর্মকাণ্ডের জন্য আপনি শান্তিতে থাকবেন নিশ্চয়। মাঝে মাঝে আমরা পুরাতন দিনের মধ্যে হারিয়ে যাব। কলেজের কর্মরত দিনগুলি ফিকে হয়ে এলেও, যখন বসে থাকি, কলেজের কথা মনে আসে, তখন ভাবি তরুণদা, মুজিবদা, বিদ্যাদা, অজিতদাকে নিয়ে আমরা একটা ঘরানার সৃষ্টি করেছিলাম। যেন আমরা কন্টেমপোরারি, তখন বয়সের তফাৎ, ব্যাচের তফাৎ ঘুচে যেত। এই সুখস্মৃতি নিয়ে আজ আমি আরও বেশি একাত্ম, তৃপ্ত, গর্বিত। একমাত্রিক এই সম্পর্ক আমাদের উন্নতি ঘটিয়েছে—আমরা এগিয়ে গিয়েছি। সকলের সঙ্গেই কথা হয়—শুধু তরুণদা হারিয়ে গেল।

**[ লেখক এই কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এবং কলেজ সার্ভিস কমিশনের সদস্যপদে আসীন। ]**

■

# ডি. এন. সি. কলেজ গড়ার ইতিহাস

মহম্মদ মোজাম্মেল হক

## প্রথমে মাদ্রাসা গড়ার ভাবনা

আজ থেকে বাহান্ন বছর আগের কথা। সালটা ১৯৬৫। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া অরঙ্গাবাদ এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ একটা মাদ্রাসা গড়ার চেষ্টা করেন। তদানীন্তন সময়ে জঙ্গীপুর লোকসভা কেন্দ্রের এমপি ছিলেন অরঙ্গাবাদের মাননীয় লুৎফল হক সাহেব। মাদ্রাসা গড়ার ইচ্ছা ও চেষ্টা মাননীয় হক সাহেবকে তারা অবগত করান। এমপি সাহেব এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করে মাদ্রাসা গড়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অরঙ্গাবাদে তখন নিমতিতা ও অরঙ্গাবাদ গার্লস হাইস্কুল চালুই ছিল।

## কলেজ করার ইচ্ছা ও ভাবনা

এলাকার উচ্চ শিক্ষিত কিছু মানুষ মাস্টার আবুল হোসেন, মোজাম্মেল হক, বেলাল হোসেন, আমিনুল কুদ্দুস ও ইদ্রিশ সাহেব প্রমুখ আরও কিছু মানুষ ভাবলেন এলাকায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের কোনো কলেজ নেই। তাই এমপি হক সাহেবকে তারা কলেজ গড়ার প্রস্তাব দেন। তারা আরও বলেন, আপনি এমপি থাকতে থাকতে অরঙ্গাবাদের ছেলে মেয়েদের দূরদূরান্ত, মালদা, জঙ্গীপুর, বহরমপুর কলেজে গিয়ে লেখাপড়া করার কষ্ট থেকে এদের বাঁচান। হক সাহেব এ প্রস্তাব আরও ভালো মনে করে এই প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেন। দু একটা এলাকায় মিটিং ডেকে সকলকে উৎসাহিত করেন। সকলের এ বিষয়ে আগ্রহ থাকায় তিনি প্রসেশিং শুরু করেন। এ বিষয়ে তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ শুরু করে দেন।

## ইউনিভার্সিটি থেকে সাড়া পাওয়ার চেষ্টা

ইউনিভার্সিটি থেকে সাড়া মিলল এবং প্রস্তাব এলো কলেজ করতে এলাকার জনগণকে জমি ও আর্থিক ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সংবাদ প্রচার হতেই এলাকায় কলেজ করার আন্দোলন, উৎসাহ, আলাপ-আলোচনা তুঙ্গে উঠে। এলাকায় কলেজ করার সকলের দারুণ সাধ। তাদের ছেলেমেয়েরা অরঙ্গাবাদেই লেখাপড়া করে আইএ, বিএ পাশ করতে পারবে এ-তো দারুণ ব্যাপার। বাড়ির খেয়ে বাড়ি থেকে হেঁটে বা সাইকেলে চেপে গিয়েই লেখাপড়া করতে পারবে, এ-তো দারুণ সুযোগ। অরঙ্গাবাদে কলেজ হবে, কলেজ হবে বলে বড়ো একটা সোরগোল পড়ে গেল। এলাকায় একটা উৎসবের আমেজ তৈরি হয়ে গেল। কারও কারও কথা হক সাহেব আছেন আর যাবে কোথায়? কে আটকাবে কলেজ হওয়া। তাই মুখে মুখে খবরটা চাওর হতে থাকল।

## কলেজ গড়া সহজ কাজ নয়

তবে ইংরাজিতে একটা কথা আছে, 'Easy to say but hard to do.' বলা সহজ, করা কঠিন।

অনেকের অনেক কিছু করার সাধ থাকে। কিন্তু সাধ্য থাকে না। এমন ঘটনা ঘটল অরঙ্গাবাদ কলেজ করতে গিয়েও।

অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা, দেবীপুর ইত্যাদি বিশ ত্রিশটা গ্রাম। এ সমস্ত গ্রামের ছেলেমেয়েদের কলেজে পড়ার সাধ আছে। কিন্তু সাধ্য অর্থাৎ খরচ-খরচা করে লেখাপড়া করার সঙ্গতি নেই। তাই তারা লেখাপড়া করতে পারে না।

## আর্থিক অভাব অনটন

কলেজ গড়ার ক্ষেত্রেও অরঙ্গাবাদ বাসীদের এমন ঘটনাই ঘটল।

ইউনিভার্সিটি থেকে কলেজ তৈরির সাড়া মিললেও কলেজ তৈরির জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করার অর্ডার

এল।

বর্তমানে অরঙ্গাবাদে অনেক বড় বড় বিড়ি কোম্পানী আছে বা হয়েছে। এখন, পঞ্চাশ হাজার টাকা দান কলেজের জন্য কোনো বড় ব্যাপারই নয়, তবে ১৯৬৫ সালে কলেজের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করা সম্ভব হয়নি। তাই অরঙ্গাবাদবাসীর টাকার অভাবে কলেজ তৈরির কাজ ঝিমিয়ে পড়ল। এমনকি টাকার অভাবে কলেজ গড়ার আন্দোলন থেমেই গেল। এলাকাবাসীর কলেজ করার সাধ থাকলেও সাধ্য না থাকার ফলে কলেজ গড়া হলো না। ১৯৬৫ সালে কলেজ গড়তে না পারার দুঃখ অরঙ্গাবাদবাসীর মনে দারুণ রেখাপাত করল।

লুৎফল হক সাহেব এমপি হিসাবে তখন খুব পপুলার নেতা। বিড়ি ইউনিয়নের কংগ্রেসের লড়াকু নাম করা নেতা। তিনি জঙ্গীপুর মহকুমা বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টও ছিলেন। টাকার যোগাড় করতে না পারার জন্য তিনি খুব অস্বস্তিতে পড়লেন। টাকার অভাব পূরণ করতে না পারায় তিনিও প্রায় ক্ষান্ত হয়ে গেলেন কলেজ গড়ার আন্দোলন থেকে।

সেবারের মতো ক্ষান্ত হলেও তিনি কিন্তু কলেজ গড়ার স্বপ্ন মন থেকে মুছে ফেললেন না। কলেজ গড়ার টাকা কীভাবে সংগ্রহ করা যায় সে চিন্তায় তিনি মসগুল থাকলেন। এদিকে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারাও কিন্তু হার মানতে নারাজ।

## বিড়ি শ্রমিকদের চাঁদা আদায়

তারা হক সাহেবকে সাহস জোগালেন একথা বলে—যেমন করেই হোক কলেজ অরঙ্গাবাদে করতেই হবে। তখন হক সাহেব আর্থিক বল বৃদ্ধির জন্য সকলকে একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন, কলেজ গড়তে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই এই অর্থ সংগ্রহ করার জন্য শ্রমিককে হাজার প্রতি তিন পয়সা এবং বিড়ি মুন্সিকে হাজার প্রতি এক পয়সা চাঁদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন। সকলে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে চাঁদা আদায়ের কাজ শুরু করে দিলেন।

কলেজ গড়ার কাজ ১৯৬৬ সালে পুনরায় জাগ্রত হলো অরঙ্গাবাদবাসীর মনে। চলতে থাকল দান গ্রহণের কাজ। দারুণ সাড়া দেখা গেল অরঙ্গাবাদ, নিমতিতা এলাকার সকল বিড়ি শ্রমিকের মনে। তাদের সকলের একটাই কথা আমরা এতসব বিড়ি শ্রমিক আছি, আমরা হারব না, আমরা ছাড়ব না। অরঙ্গাবাদে আমরা কলেজ গড়বোই, এরকম একটা শপথ তারা মনে মনে গ্রহণ করেই নিল। দারুণ উৎসাহে গোটা সাবডিভিশন ব্যাপী দান করা ও দান গ্রহণের কাজ দারুণ উৎসাহের সাথে চলতেই থাকল। তাদের কথা, আমাদের এমপি হক সাহেব আছেন আমাদের সঙ্গে। তাই কলেজ হবেই হবে। কলেজ আমরা গড়বোই।

জোর কদমে চাঁদা কালেকশন চলতে থাকে। কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে কলেজ গড়ার প্রসেশিংও চলতে থাকে। দেখতে দেখতে বছর শেষ। ইউনিভার্সিটি থেকে এমপি হক সাহেবের কাছে ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করার নির্দেশপত্র এসে গেল।

## চাঁদার অর্থই যথেষ্ট নয়

এদিকে বিড়ি শ্রমিকদের দানের টাকা সারা বছরে যা সংগ্রহ হলো তা'তে পঞ্চাশ হাজার টাকা পূরণ হলো না। বাকি অর্দ্ধেক টাকা কোথায় পাওয়া যায়, এ চিন্তায় এমপি হক সাহেব খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বিড়ি শ্রমিকরা দলে দলে পয়সা দিয়েও কলেজ যদি না হয়, তবে এমপি সাহেবের মান-সম্মান বাঁচানোর প্রশ্ন এসে গেল। এ টাকায় কলেজ হবে না। একথাও তিনি বলতে পারলেন না। টাকা পয়সা যা জমা হয়েছে, তা ফেরত দেওয়াও যাবে না। ফেরত দিলেও শ্রমিকদের এবং এলাকার লোকের মনে অসন্তোষ দেখা দিবে। জাত, ইজ্জত, মান-সম্মান বাঁচানো যাবে না ভেবে তিনি তখন খুব দুশ্চিন্তায় পড়লেন। ১৯৬৫ সালে একবার করা সম্ভব হয়নি আবার এ বছরে যদি কলেজ করতে না পারি তবে এমপি সাহেবের ক্ষমতার প্রশ্নও উঠবে।

## চাঁদা ছাড়া অন্য অর্থের ব্যবস্থা

কিছুতেই পিছু হটা চলবে না। তাই তিনি তখনকার অরঙ্গাবাদের একমাত্র নামকরা ধনী দাস কোম্পানীর কর্ণধার দিলীপ দাসের শরণাপন্ন হলেন। বিষয়টা তাঁকে বুঝিয়ে বলায় তিনি টাকা দেবার সম্মতি দান করেন।

## অর্থ নিলে নাম সমস্যা

তিনি হক সাহেবকে প্রশ্ন করলেন এত টাকা আমি দেব, কিন্তু আমি কী পাব? আমার কোম্পানী কী পাবে? হক সাহেব পড়লেন বিপদে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি, টাকা না নিলে কলেজ হবে না। কলেজ না হলে এলাকার ছেলেমেয়েদের কলেজে এখানে লেখাপড়ার সুযোগ হবে না। আর এতদূর এগিয়ে পেছনোও যাবে না। তাই এমবিএম কোম্পানীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি চান বলুন?

মালিক দিলীপ দাস বললেন, কলেজটার নাম আমাদের কোম্পানীর নামে হলে যত টাকা লাগবে, আমরা দেব।

এদিকে দু'বছর ধরে বিড়ি শ্রমিকদের আন্দোলনে কলেজ হবে। তাই কলেজের নাম ঠিক করে রেখেছে, শ্রমিকরা 'অরঙ্গাবাদ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন কলেজ'। মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী অর্থাৎ সংক্ষেপে এমবিএম কোং টাকা

দিলে নাম দিবে তাদের মতো। তারা নামের প্রস্তাব দিল, দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ, সংক্ষেপে ডিএনসি।

### নাম নিয়ে প্রকট সমস্যা

একদিকে বিড়ি শ্রমিকদের দাবী তাদের আন্দোলনের ও দানের টাকায় কলেজ। তাই তাদের নির্বাচিত নাম রাখতেই হবে। অন্যদিকে এমবিএম কোম্পানীর টাকার সাহায্য নিলে নাম হতে হবে ডিএনসি, এ এক নতুন সমস্যা, নামকরণের সমস্যা। বিরাট সমস্যা। কীভাবে এ সমস্যা থেকে বের হওয়া যায় সে চিন্তায় হক সাহেব খুবই মুশকিলে পড়লেন। সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি দিলীপ দাসের কাছে কয়েকদিন সময় নিলেন। কয়েকজন ইউনিয়নের নেতাকে ডাকলেন। আলাপ আলোচনা করলেন। কিন্তু ইউনিয়নের নেতারাও কোনো সমাধান করতে পারলেন না। তাদের যুক্তি অন্য নামে কলেজ হলে বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যরা সেটা কিছুতেই মানবে না। এমনকি ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাবে বলে অনেকে মন্তব্য করলেন। হক সাহেব পড়লেন বিপদে। কি করা যায় কিছুই ঠাহর করতে না পেরে তিনি রাতের ঘুম পর্যন্ত হারালেন।

### নাম রাখার জন্য হক সাহেবের শক্ত পদক্ষেপ

পরপর কয়েকদিন আলোচনা করে যখন কোনো কিছু স্থির করতে পারলেন না, তখন বিচক্ষণতার সাথে হক সাহেব সকলকে বললেন, শ্রমিকদের চাঁদা ও দানের টাকা যতটা সংগ্রহ হয়েছে, তাতে কলেজ করা যাবে না। আর কলেজ করতে না পারলে আমাদের এলাকার ছেলেমেয়েদের কলেজে লেখাপড়া করার সুযোগ-সুবিধাও পাওয়া যাবে না। তাই যে যতই আমার বিরোধিতা করুক, আর ইউনিয়নই ভাঙ্গুক, ডিএনসি নাম দিয়ে যদি টাকা নিয়ে কলেজ তৈরি হয়, তবে তাই হোক। কলেজ যে নামেই হয় হোক, সেটাই আমি চাই।

### দিলীপ দাসের অর্থ দান ও কলেজ অনুমোদন

হক সাহেবের যুক্তিটা কনস্ট্রাকটিভ। অনেকে যুক্তিটা মেনে তখন ডিএনসি নামকে সমর্থন জানায়। কিছু শ্রমিক ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাতে কোনো কর্ণপাত না করে হক সাহেব দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র দাসের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ইউনিভার্সিটির ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করে দেন। কলেজের নাম 'অরঙ্গাবাদ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন' না হলেও এমবিএম কোম্পানীর আর্থিক সহযোগিতায় আমরা অরঙ্গাবাদ এলাকার মানুষ, ডিএনসি নামে কলেজ পেয়েছি। কলেজের নাম 'অরঙ্গাবাদ বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন কলেজ' না হওয়ায় কিছু মানুষের হয়তো এখনো ক্ষোভ থাকতে পারে। তবে এমবিএম কোম্পানীর আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা না নিয়ে কলেজ না গড়লে সেটা হতো ঐতিহাসিক ভুল।

### কলেজ স্টাফ নিয়োগ

১লা জুলাই ১৯৬৭-তে শ্রী বিজনকান্তি বিশ্বাসকে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হয়।

তারপর ডিএনসি কলেজে ১৯৬৭ সালের ১৬ই জুলাই ৬ জন অধ্যাপক নিয়োগ করে। ২৩/৭/১৯৬৭-তে আরও একজন অধ্যাপক নিয়োগ হয়। নজরুল ইসলাম মহাশয়কে অ্যাকাউনটেন্ট হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ১৯৭১ থেকে ২০১২'র ১লা অক্টোবর পর্যন্ত তিনি কাজ করেন। পঠন-পাঠনের সকল বিষয়ের সুবিধার্থে অধ্যাপকগণকে নিম্নলিখিত বিষয়ে শিক্ষাদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

১। অধ্যাপক শ্রী বিশ্বনাথ রায়—বাংলা।
২। অধ্যাপক শ্রী সুধারঞ্জন সেনগুপ্ত—ইংরাজি।
৩। অধ্যাপক শ্রী শ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য—রাষ্ট্র বিজ্ঞান।
৪। অধ্যাপক শ্রী বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—ইতিহাস।
৫। অধ্যাপক শ্রী জ্যোতি কুমার রায়—ইকোনোমিক্স।
৬। অধ্যাপক শ্রী শান্তিরঞ্জন পাণ্ডে—ফিলোজফি।
৭। অধ্যাপক শ্রী জগবন্ধু মণ্ডল—কমার্স বিভাগ।

### ছাত্র ভর্তি শুরু

প্রথম বর্ষ কলা বিভাগ ও প্রি ইউনিভার্সিটি ক্লাসে প্রথম বছর ছাত্র ভর্তি নেওয়া হয়।

প্রথম বর্ষ কলা বিভাগে ৯৮ জন ছাত্র এবং প্রি ইউনিভার্সিটি ক্লাসে ১২৭ জন ছাত্র অর্থাৎ মোট ২২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজ চালু হয়।

বহরমপুর কে এন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, মাননীয় শ্রী রাম পাল মহাশয় ১৯৬৭ সালের ২৩শে আগস্ট অরঙ্গাবাদ ডিএনসি কলেজ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

### কলেজ বিল্ডিং সমস্যা

১৯৬৭ সালের ২৩শে আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হলেও কলেজের নিজস্ব বিল্ডিং না থাকায় অরঙ্গাবাদের হাইস্কুলের পূর্বে বড় এক পাট গোদামে পঠন-পাঠনের কাজ অস্থায়ীভাবে চালু করা হয়। কলেজের নিজস্ব বিল্ডিং গড়ার কাজ করতে প্রায় বছর খানেক সময় লাগে।

যতদূর জানা যায়, প্রথম বছর ফারাক্কার বিজয় মণ্ডল, বেনীয়া গ্রামের রথীন্দ্রনাথ পাণ্ডে, হাজার পুরের অশোক কুমার দাস,

অরঙ্গাবাদের মহ. জালালুদ্দিন প্রমুখ ছাত্রগণ ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসে ভর্তি হয়। মোট ছাত্রছাত্রী সংগ্রহ হয় ৯৮ জন।

### নিজস্ব ভবনে কলেজ উদ্বোধন

কলেজের নিজস্ব বিল্ডিং তৈরি হলে ১৯৬৮ সালের ১১ই নভেম্বর ড. সত্যেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়, কলকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর, এই কলেজের নিজস্ব ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন। ১৯৬৭ সালের কলেজের সূচনার পর আজও ডিএনসি কলেজ উন্নতির দিকে এগিয়েই চলেছে। বর্তমানে ৪.৯১ একর জমির উপর পুকুর সহ বিভিন্ন বিল্ডিং-এর অবস্থান আছে।

### পিছিয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায় শিক্ষায় অধিক লাভবান

শুরুতে ৭ জন অধ্যাপক, ফার্স্ট ইয়ারে ৯৮ জন এবং প্রি ইউনিভার্সিটি ১২৭—মোট ২২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে ডিএনসি কলেজ পথ চলা শুরু করে।

শুরুতে এই কলেজে অধিকাংশ হিন্দু পরিবারের ছেলেমেয়েরা ভর্তি হয়ে শিক্ষালাভ করত। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়া মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা গ্রহণে এগিয়ে আসে। অরঙ্গাবাদে এই কলেজ না হলে বিশেষত: মুসলিম ছেলেমেয়েরা এত বেশি লেখাপড়া করার উৎসাহ পেত না। বর্তমানে মুসলিম পরিবারের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা শতকরা পয়ষট্টি-সত্তর ভাগ। উল্লেখ্য, এই কলেজে ছাত্র অপেক্ষা ছাত্রীর সংখ্যা অধিক। আরও উল্লেখ্য, মুসলিম পরিবারের ছাত্রর চাইতে ছাত্রীর সংখ্যা অধিক। যখন অরঙ্গাবাদে এই কলেজ ছিল না, তখন মুসলিম মেয়েদের কলেজে পড়ার শতকরা কোনো হারই ছিল না। মেয়েরা কোনো প্রকারে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করার পর লেখাপড়ার ইতি টানত। এই কলেজ হবার ফলে এলাকার ফার্স্ট জেনারেশনদের এই উচ্চ শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কলেজের প্রাক্তন অ্যাকাউনটেন্ট নজরুল ইসলাম সাহেবের মিসেস রুবেদা খাতুন এই কলেজের ১৯৭৪ সালের গ্র্যাজুয়েট। রুবেদা খাতুনের কথা, ১৯৭৪ সালে তার ক্লাসে মাত্র ৪ জন মুসলিম ছাত্রী ছিল। বর্তমানে কলেজের চল্লিশ পার্সেন্ট ছাত্রীর মধ্যে বাইশ পার্সেন্ট ফার্স্ট জেনারেশন মুসলিম মেয়ে এবং আঠারো পার্সেন্ট হিন্দু মেয়ে। এটা এক উল্লেখযোগ্য মুসলিমদের শিক্ষার অগ্রগতি ও উন্নতি। যা নিঃসন্দেহে এই কলেজেরই দান।

### কলেজের সেকাল ও একাল

আজ পর্যন্ত কলেজে প্রিন্সিপ্যাল সহ ১৭ জন স্থায়ী অধ্যাপক, ২০ জন পার্ট টাইমার ও ১ জন কন্ট্যাকচুয়াল অধ্যাপক এই কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন পাঠন দানে লিপ্ত আছেন। বর্তমানে কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চার হাজার।

মাননীয় প্রফেসর ইনচার্জ নিজপদে আসীন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সুনিপুণ ও সুদক্ষ অধ্যাপকদের নিয়ে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের মানোন্নয়নের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন এবং কলেজে সুনাম বজায় রেখেছেন। উল্লেখ্য, কয়েকজন সাধারণ কর্মী সহ প্রধান করণিককে সঙ্গে নিয়ে মাননীয় প্রফেসর ইনচার্জকে কলেজ ছুটির পরও দীর্ঘক্ষণ অফিসে কর্মরত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। যা আজকের দিনে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে।

### এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষালাভ

ডিএনসি কলেজ অরঙ্গাবাদে গড়তে পারায় এলাকার অজস্র ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষালাভ করে আজ তারা দেশ বিদেশে পাঠরত অথবা চাকুরীরত। আগামীতে আরও কত ছাত্রছাত্রী কত উচ্চ শিক্ষালাভ করবে তা সময়ই বলবে।

### জনগণের আশীর্বাদ

কলেজ চলতে এবং চালাতে কিছু সমস্যা থাকেই। তার মধ্য দিয়েই আমাদেরকে সমাধানের এবং উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হবে। বর্তমানে কলেজের দু'জন ডোনারের নাম আছে। বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের একজন এবং দিলীপ দাস মহাশয়ের পক্ষে একজন। দু'জন ডোনারের নাম রাখা যাবে না বলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা'ও সুস্থ মাথায় সমাধান করতে হবে।

উল্লেখ্য, এই কলেজ গড়ার প্রধান দুই সৈনিক যথা এমপি লুৎফল হক সাহেব এবং দিলীপ দাস মহাশয় আজ আমাদের মধ্যে নেই। তাঁরা মারা গেছেন। যতদূর জানা যায় হক সাহেব ১৯৮৬ সালে মারা গেছেন। দিলীপ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর তারিখ না জানা থাকায় উল্লেখ করা সম্ভব হলো না।

আসুন, আজ আমরা সকলে দু' হাত ভরে আশীর্বাদ করি, যাদের অক্লান্ত ও মহৎ পরিশ্রমের ফলে এই কলেজ গড়ে উঠেছে—যেমন, এলাকার বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন দল, বিদ্যোৎসাহী সংগঠক নেতা-নেত্রী, আর্থিক সাহায্য সহযোগীগণকে, তাদের এই মহৎ কাজের জন্য সকলের আত্মার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি।

আর উচ্চকণ্ঠে সবাই বলি, আমাদের এই ডিএনসি কলেজের মহান সংগঠক, লুৎফল হক, দিলীপ দাস ও বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়ন দল ও সকল সংগঠক অমর রহে।

*—জয়হিন্দ। বন্দেমাতরম*

[লেখক একজন স্থানীয় শিক্ষাবিদ ও লুথার ইনস্টিটিউশনের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁর লেখা, 'নিশ্চিত সাফল্যের উপায়', 'রোগমুক্তি, সুস্বাস্থ্য ও শতায়ুলাভ' এবং 'প্রাণবন্ত দুর্দান্ত এক মেয়ে' বই ৩ খানি তিনি কলেজ লাইব্রেরিতে দান করেছেন।]

# দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ

মোহন কুমার দাস

কলেজের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের তরফে অনুরোধ এসেছে কলেজকে কেন্দ্র করে একটি লেখার জন্য। কিন্তু কতটুকুই বা জ্ঞান আমার? আর কী-ই বা জানি? গত পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমাদের কলেজের শিক্ষাদান, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, ছাত্র-শিক্ষক রাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি, ক্রীড়া বিষয়ক এবং দীর্ঘদিন স্থায়ী অধ্যক্ষের পদ খালি থাকা—প্রভৃতি বিষয়ে লিখতে গেলে তো একটি মহাকাব্য রচিত হয়ে যাবে। কিন্তু সে ক্ষমতা আমার নেই—কারণ, লেখালেখির ব্যাপারে পারদর্শী নই আমি মোটেই। তাই জ্ঞানীগুণী জনের কাছ থেকে জানতে পেরে সীমিত সামর্থের মধ্যে আমাদের কলেজের শুধু নামকরণের সার্থকতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা বা লেখার চেষ্টা করব—যা বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে আসতে পারে।

বাংলার রাজনৈতিক আকাশে তখন কালো মেঘের ঘনঘটা। ফুঁসছে সারা বাংলা। ব্রিটিশের বাংলা ভাগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তেতে উঠেছে অখণ্ড বঙ্গ। প্রতিশোধ স্পৃহায় দেশজ শিল্পের গতিরোধ করতে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে। দেশীয় শিল্প ও পণ্যের উপর ক্রমাগত কর বাড়াচ্ছে আর ওদিকে বিদেশী পণ্যের আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করছে। কিন্তু বাঙালি মস্তিষ্ক-স্বাদেশিকতার জোয়ারে ভেসে বিদেশি পণ্য বর্জনের ডাক দিয়ে স্বদেশি শিল্প গড়ার আহ্বান জানাচ্ছে। ফলে দিকে দিকে পত্তন হতে শুরু করেছে ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার।

এই স্বাদেশিকতার আন্দোলনে আন্দোলিত হয়েই মুর্শিদাবাদ জেলার ছোট্ট গঞ্জ—অরঙ্গাবাদে অত্যন্ত দুঃস্থ-দরিদ্র পরিবারের দুই সহোদর নিবারণ চন্দ্র দাস ও দুঃখুলাল দাস ১৯২৪ সালে মাত্র ২/৩ জন সঙ্গী শ্রমিক নিয়ে বীজ বপন করেছিলেন একটি অতিক্ষুদ্র বিড়ি কারখানার—যা পরবর্তীতে বিশাল মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে এমবিএম কোম্পানী লিমিটেড নামে এবং বর্তমানে শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছে। সে এক অন্য ইতিহাস যা আজও মানুষের মুখে মুখে মুখরিত।

অগ্রজ নিবারণ চন্দ্র ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা এবং অনুজ দুঃখুলাল ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক। তাঁরা উভয়েই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত না হয়েও শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের অদম্য স্পৃহার প্রমাণ এলাকায় আজও বিদ্যমান। প্রায় শতবর্ষ পূর্বে এতদঞ্চলকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেখাতে তাঁরাই প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন—ছাবঘাটী কে ডি বিদ্যালয়, অরঙ্গাবাদ জুনিয়র হাইস্কুল, অরঙ্গাবাদ বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করে কোনোরকম ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছাড়াই। এই শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্বদ্বয়ের স্মৃতি অক্ষুন্ন রাখতেই আমাদের এই কলেজের নামকরণ হয়েছিল 'দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ'। কিন্তু কেন এবং কীভাবে?

...দেখতে দেখতে আসমুদ্র হিমাচল—সারা ভারতবর্ষে এমবিএম কোং লিমিটেডের ব্যবসা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে গেল। দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ বছর ব্যাপী অপ্রতিরোধ্য অগ্রগমনের সাফল্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে হাজার হাজার মেহনতি মানুষ জীবিকা নির্বাহের পথ পেলেন এই দুই মহান দাতা এবং মানবদরদী'র আশ্রয়ে। কালের অমোঘ নিয়মে যথাসময়েই বৈকুণ্ঠলোকে যাত্রা করেন তাঁরা। কিন্তু

ইতিমধ্যেই তৈরি করে দিয়েছেন তাঁদের প্রকৃত উত্তরসূরী। দুঃখুলাল দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র দিলীপ কুমার দাস, কোম্পানী পরিচালনার গুরুদায়িত্ব স্বীকার করলেন—পূর্বপুরুষের বকেয়া কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, শুধু কোম্পানী নয়— পিতা ও পিতৃব্যের বহু অসমাপ্ত সামাজিক কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার গুরুদায়িত্বও স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন তিনি। 'তারপরেই ছুটল তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া'—বিদগ্ধ জনের মন্তব্য অনুসারে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা ও পরিকল্পনার সূচনা পর্বের সঙ্গে যেসব শিক্ষাবিদ বা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব যুক্ত ছিলেন—তাঁদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ-ই আজ আমাদের মধ্যে নেই—কিন্তু কারোর কারোর বিদগ্ধ মতামত বা মন্তব্য আজও লিপিবদ্ধ অবস্থায় বর্তমান।

এতদাঞ্চলের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতপ্রবর প্রয়াত জীবেন্দ্র কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের লেখা থেকে জানতে পারি—'...প্রাথমিক অবস্থাতেই সেই সময়ের অনুপাতে একটা বিশাল অঙ্কের অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে Reserve Fund হিসেবে। তবেই কলেজ অনুমোদনের চেষ্টার পথে অগ্রগমন করা সম্ভব হবে। এককালীন এই বিশাল পরিমান অর্থ (৫০,০০০ টাকা) কী করে সংগৃহীত হবে— বড়ো ভাবনা। পঞ্চাশ বছর পূর্বের ৫০,০০০ টাকা এবং বর্তমান সময়ের ৫০,০০০ টাকার পার্থক্য সহজেই অনুমেয়। উদ্যোক্তাদের মাথায় হাত।

অবশেষে দিলীপবাবু পথ দেখালেন শ্রদ্ধেয় জননেতা প্রয়াত লুৎফল হক সাহেবের সুপরামর্শে। পারিবারিক আলোচনান্তে তিনি অঙ্গীকার করলেন—এই পরিমাণ অর্থের সংস্থান তাঁর পরিবারই করবে এবং প্রয়োজনে ব্যবসায়িক বা অন্যান্য সূত্র থেকেও যথাসম্ভব অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করবেন, তা করেছিলেনও। স্বীকৃতি হিসেবে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হয়েছিল—প্রস্তাবিত কলেজের নাম হবে 'দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ'। এই প্রসঙ্গে আরও ২/১টি প্রস্তাব উঠেছিল—কিন্তু দুরদর্শী, উদারহৃদয় জননেতা সম্মানীয় হক সাহেবের অনমনীয় মনোভাবে তা গ্রাহ্য হয়নি। সংগঠক হিসেবে এমনই পারদর্শী ছিলেন তিনি।

শ্রদ্ধেয় ও প্রয়াত এলাকার জনপ্রিয় মাষ্টারমহাশয় এবং সেইসঙ্গে সুপরিচিত ক্রীড়াব্যক্তিত্ব আবুল হোসেন মহাশয়-এর লেখা থেকে আরও জানা যায়, ...আকাঙ্ক্ষিত পরবর্তী দিন ২২শে জানুয়ারি ১৯৬৬, সন্ধ্যায় দিলীপবাবুর চেম্বারে আমরা সবাই বসি। জননেতা লুৎফল হক সাহেব প্রস্তাবিত কলেজের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার পর দাস পরিবারের প্রতি প্রস্তাব রাখেন—তোমরা এই পঞ্চাশ হাজার টাকা কলেজকে দান করো ও বাবা-জ্যাঠার নামে কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হও—এলাকায় শিক্ষার প্রসার ঘটুক। উপস্থিত সবাই সানন্দে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। এভাবেই দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজের নাম স্থির হয়েছিল বলে জানা যায়।

অতঃপর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে এবং সেই নিয়মেই দুঃখুলাল নিবারণ চন্দ্র কলেজ কিছু ভালো এবং না-ভালোর পথ বেয়ে পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে পৌঁছেছে। কিছু সমাজসেবী, মানবদরদী, শিক্ষানুরাগী মানুষের এই মহান কীর্তির ফলেই আজ এলাকায় ঘরে ঘরে পাওয়া যায় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর শ্রেণির বহু ছাত্র-ছাত্রী। যা ছিল একসময় স্বপ্ন বা কল্পনারও অতীত। এই প্রাক্তন ছাত্রের আশা এবং একান্ত কামনা—শতায়ুর দিকে অগ্রগমন হোক আমার প্রিয় এই মহাবিদ্যালয়ের। শুভায়ু ভবতু।

(প্রাক্তন ছাত্র)

'তরুণ প্রজন্মের কাছে আমার আহ্বান হলো, ভিন্নভাবে চিন্তা করার সাহস থাকতে হবে। আবিষ্কারের নেশা থাকতে হবে। যে পথে কেউ যায়নি, সে পথে চলতে হবে। অসম্ভবকে সম্ভব করার সাহস থাকতে হবে। সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর সফল হতে হবে। এগুলোই হলো সবচেয়ে মহৎ গুণ। এভাবেই তাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। তরুণদের কাছে এটাই আমার বার্তা।'

—এ. পি. জে. আব্দুল কালাম

## নবীন বরণ

## ডি. পি. আই. জেলা ফুটবল

## ডি. পি. আই. ফুটবল (দ্বিতীয় বর্ষ)

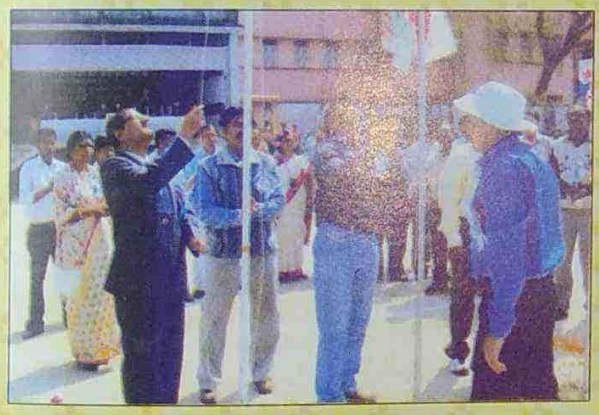

## ডি. পি. আই. অ্যাথলিট ও ফুটবল, মুর্শিদাবাদ জেলা (তৃতীয় বর্ষ)

## ইউনিভার্সিটি ফুটবল

## ইউনিভার্সিটি জেলা ফুটবল

## ইউনিভার্সিটি আন্তঃকলেজ ভলিবল

## ইউনিভার্সিটি টেবল টেনিস টুর্নামেন্ট

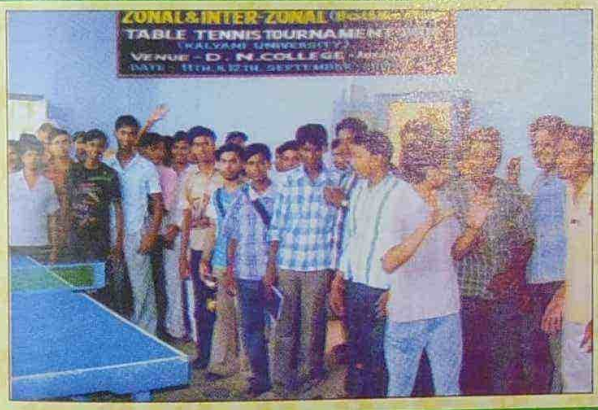

## ডি. এন. কলেজ প্রাক্তনি সমিতি আয়োজিত স্বাস্থ্য শিবির

## উল্লেখযোগ্য কিছু মুহূর্ত

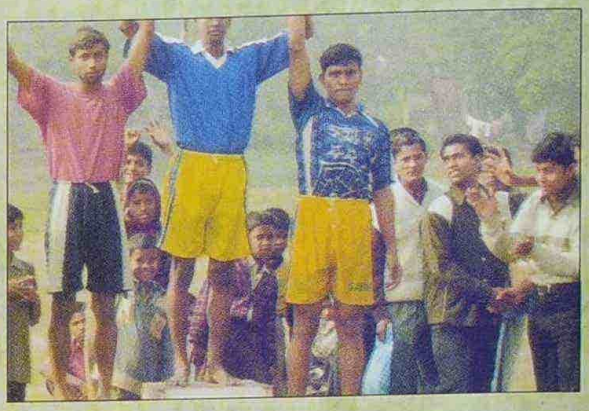

## অধ্যাপক রামচন্দ্র দাস বিদায় সংবর্ধনা

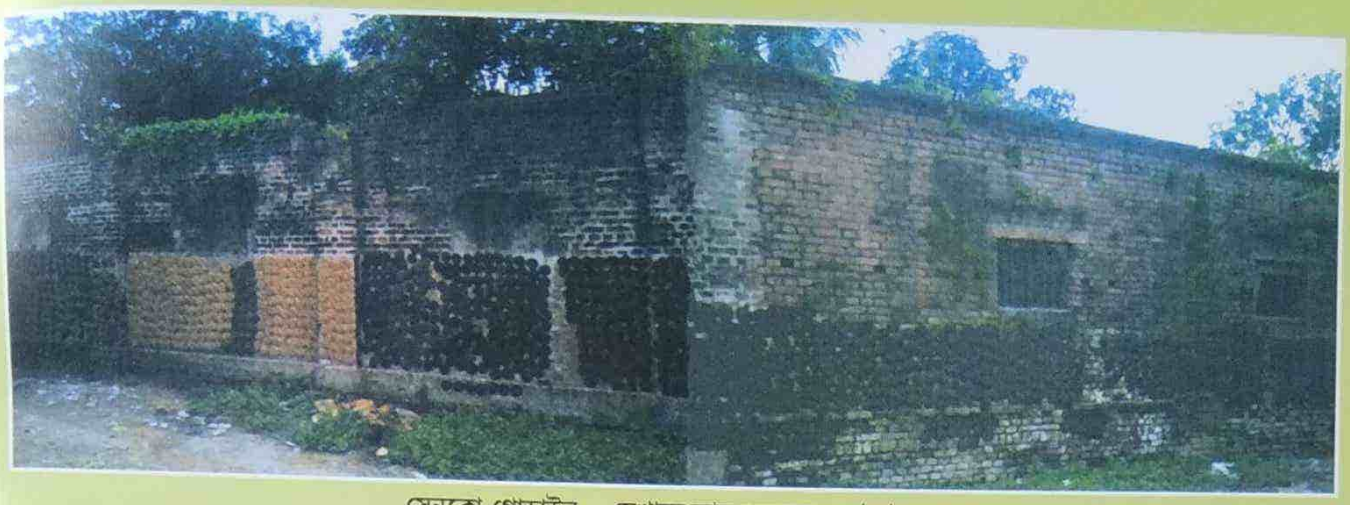

সেনকো গোডাউন— যেখানে ক্লাস শুরু হয় ২৩/৮/৬৭

জমিদাতা স্বর্গীয় বিজয়কুমার সরকার

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ বিজয়কান্তি বিশ্বাস

জমিদানকারী মাননীয় সর্বজনাব সাজাহান বিশ্বাস, ইমানি বিশ্বাস, মোস্তফা বিশ্বাস ও ফারুক বিশ্বাস
ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের হাতে রেজিস্ট্রি দলিল তুলে দিচ্ছেন।

অধ্যক্ষ ও শিক্ষক আবাস

কলেজ ফুল বাগান, NSS কর্তৃক

কলেজের প্রার্থনা গৃহ

কলেজ মাঠ

কলেজ লাইব্রেরী

পদার্থবিদ্যার বিভাগীয় ল্যাবরেটরী

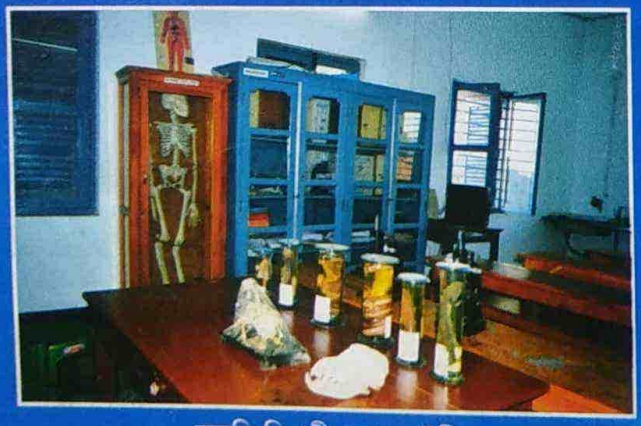

জুলজি বিভাগীয় ল্যাবরেটরী

কলেজ অফিস ঘর